

শরদিন্দুর ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্যের প্রকরণ বিচার

‘বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিতে সমাজচিত্র বেশি পাই না।’^১ কথাটা অংশত সত্য হলেও একবাক্যে স্বীকার করা যায় না। কারণ একজন লেখক দেশ-কাল-সময়াশ্রয়ী ইতিহাস-নির্ভর আখ্যান রচনা করেছেন তাতে হয়তো ‘ব্যক্তি চরিত্র’ বা ‘বীরচরিত্র’ (Hero Whorship) বড় হয়ে উঠেছে। তাছাড়া বলা যায়, মহৎ করে দেখানো হয়েছে ইতিহাসের বীর যোদ্ধা ও পৌরুষদীপ্ত ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বদের। তবে সমাজচিত্র বড় হয়ে ওঠেনি তা নয়। প্রকৃত ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাসে অতীতের স্থান-কাল-পাত্র-পাত্রী সমান গুরুত্বের সঙ্গে বর্ণিত হয়। প্রকৃত ইতিহাস বিকৃত হয় না; ইতিহাসের সত্যেরও হয় না অপলাপ। এই ধরনের উপন্যাসগুলিতে ইতিহাসবীরের পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে সঙ্গে গোটা সমাজচিত্রটাই বিধৃত হয়। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্যগুলি তাঁর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ইতিহাসাশ্রিত দু’একটি ছোটগল্প ইতিহাস বীরের চরিত্র পুনঃসৃষ্ট হয়েছে ঠিকই কিন্তু সমাজ পারিপার্শ্বিকতা বাদ পড়েনি। উপন্যাসের ক্ষেত্রে একেবারেই চরিত্র পূজা তিনি করেন নি। সেকালের সামগ্রিক সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মনৈতিক জীবনের ছবি এঁকেছেন। উপন্যাসের নামকরণের মধ্যেই তা বোঝা যায়। যেমন— ‘কালের মন্দির’, ‘গৌড় মল্লার’, ‘তুমি সন্ধ্যার মেঘ’, ‘তুঙ্গভদ্রার তীরে’ ও ‘কুমার সম্ভবের কবি’। ‘কুমার সম্ভবের কবি’তে কালিদাসের কবি হয়ে ওঠার কাহিনি বিধৃত হলেও সেকালের সমাজ নগর জনপদ ইত্যাদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বর্ণিত হয়েছে। বলা যায়, সেকালের সামগ্রিক সমাজজীবন যেন ফুটে উঠেছে এই উপন্যাসটির আখ্যান বস্তুতে।

বস্তুত এক সময় বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসে ঔপন্যাসিকগণ বীর বিক্রম কেশরী ইতিহাসের রাজা সম্রাট বাদশাহগণের চরিত্র নিয়ে উপন্যাস রচনায় ব্রতী থেকেছেন। তখন ইতিহাস বীরেরাই বড় জায়গা দখল করেছিলেন। কিন্তু বিশ শতকের তিনের দশকের কথা সাহিত্যিক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় সেই প্রবণতায় জল ঢাললেন। তিনি ইতিহাসের প্রকৃত চর্চা ও অনুশীলনে ব্রতী হলেন। ইতিহাসে মানে কি শুধুই বীর ব্যক্তি চরিত্রের উপস্থাপনা? তাঁর মনে প্রশ্ন জাগে। তাইতো তিনি ইতিহাসের প্রকৃত রূপ বলতে যা বোঝেন সেই প্রকৃত বিষয়টিই রচনায় স্থান দিলেন। বলা যায়, ইতিহাস হল—“মানবিক ঘটনা এবং মানবিক বিবর্তনের ধারাবাহিক বিবরণই হল যথার্থ ইতিহাস।”^২ অতএব, বলা যায়, ইতিহাস মানুষের বেড়ে ওঠার কাহিনি। যেহেতু মানুষ সামাজিক জীব, সমাজে বেড়ে ওঠার কাহিনি যাদের শাস্ত্রত সত্য ঘটনা সেহেতু ইতিহাস আলোচনায় সমাজ

বাদ পড়তে পারে না নিশ্চিতভাবে। যাঁদের লেখায় সমাজ মূল্যবান নয়, শুধুই ব্যক্তি বড় হয়ে উঠেছে তাঁদের পর্যবেক্ষণ শক্তি ও সাধনা দুই-ই একদেশদর্শিতার পরিচয় দেয়। কেননা ইতিহাস সৃষ্টি ও সংরক্ষণ যুগপদ সমাজের অন্তর্গত মানুষই করে।

যাইহোক, উনিশ শতকে ইতিহাসমূলক আখ্যান রচনার যে প্রবণতা তা ক্ষীণ হতে শুরু করেছে বিংশ শতকের ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকদের হাতে। বস্তুলীন মনোভাব ও জনতার ছাপ দুই-ই এই সময়ের লেখকের রচনায় পাওয়া যায়। আমরা বলতে পারি—মানুষই ইতিহাস গড়ে আবার অর্বাচীন মানুষই ইতিহাস পুনঃ সৃষ্টি করে। সাহিত্যের আধারে যাঁরা ইতিহাস পুনঃ সৃষ্টি করেন তাঁরা লেখক সাহিত্যিক। ইতিহাসের সত্য ও তথ্যের নিরিখে কল্পনা মিশিয়ে প্রকৃত মানবরস সৃষ্টি করেন। যদি কেউ বলে থাকেন ইতিহাস লেখক কখনোই সেটা করেন না তা সম্পূর্ণ ভুল। শুধু কেটে ছেঁটে জোড়া দিয়ে সাজিয়ে দিলেই ইতিহাস লেখার কাজ সম্পন্ন হয় না। চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার পূর্বকার ইতিহাস যখন কোনো একজন ঐতিহাসিক লেখেন তখন কি তাঁর কল্পনা কাজ করে না? মনে হয় করে। একজন বিখ্যাত পাশ্চাত্য সমালোচকের মন্তব্যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠবে—

“Filled up the narrative of caesar’s doings with fanciful details such as the names of the persons he met on the way, and what he said to them, the construction would be arbitrary : it would be in fact the kind of construction which is done by an historical novelist.”^৩

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্যের প্রকরণ বিন্যাস-প্রসঙ্গ আলোচনা করা যাক। কারণ, সামাজিক, রাজনৈতিক, আঞ্চলিক, মনস্তাত্ত্বিক, চেতনা প্রবাহধর্মী, কারাধর্মী, কাব্যধর্মী প্রভৃতি উপন্যাসের সঙ্গে ইতিহাসধর্মী আখ্যানমূলক উপন্যাসের পার্থক্য বিদ্যমান। যদিও প্রত্যেকটি প্রকরণ স্বতন্ত্র ও স্বগঠনমূলক তবুও উপন্যাসের সত্যের খাতিরে এক গোত্রভুক্ত।

প্রকরণ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবার পূর্বে ‘প্রকরণ’ কি সে বিষয়ে আলোচনা করা যাক। ‘প্রকরণ’ হ’ল একথায় শিল্প। অন্যার্থে করণ বা রূপায়ণ আর আঙ্গিক কথার অর্থ হ’ল অঙ্গের করণ। দু’টো কথাতেই করণ শব্দটি সমতুল অর্থে ব্যবহৃত হলেও দু’টো কথার মধ্যে একটা সূক্ষ্ম পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। শিল্প হচ্ছে সামগ্রিক রূপকৃতি আর শিল্পাঙ্গিক রূপকৃত্যের বিভিন্ন দিক। বলা যায়, বিষয় কাহিনি, চরিত্র, ঘটনা, নাটকীয়তা, কবিত্ব, তত্ত্ব, ভাষা, মনস্তাত্ত্বিক অন্তর্দ্বন্দ্ব,

লেখকের জীবন দর্শন, দৃষ্টিকোণ, প্রতিবেশ ও সময় বা কাল শিল্পের বিভিন্ন অঙ্গ। উক্ত অঙ্গের সংযোজনায় গোটা শিল্পের ছাঁদ তৈরি হয়। শিল্প তার যথার্থ শিল্পীত রূপ পায়। উল্লেখ্য গুণময় মান্না তাঁর ‘বাঙলা উপন্যাসের শিল্পাঙ্গিক’ বইটির ভূমিকাংশে প্রকরণ বিষয় প্রসঙ্গে 'Form' এবং 'Content' আলোচনা করতে গিয়ে 'content' বা বিষয়কে 'Form' বা আঙ্গিকের অঙ্গ হিসেবে দেখেছেন। যদিও ‘মাকসীয় সাহিত্য তত্ত্বে’ ড. বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় মাকসীয় সাহিত্য আলোচনায় সামাজিক মূল্যবোধ ও ধ্যানধারণার বদলীক 'Form' এবং 'content' বলেছেন। তাঁর কথায়— “ ‘কন্টেন্ট’ ও ‘ফর্ম’ -এর সম্পর্ক ‘ডায়ালেকটিক্যাল বা দ্বন্দ্ব মূলক।’” (মাকসীয় সাহিত্যতত্ত্ব, পৃ. ৩৫) আমরা বলতে পারি, উভয়ের সূক্ষ্ম পার্থক্য থাকলেও একে অপরের সম্পর্কও বিদ্যমান। উভয়ের সমন্বয়ে শিল্প তৈরি হয়। এমনকি শিল্প শৈলীর পরিপূরকরূপ প্রকরণ বিষয়টিও সম্পূর্ণরূপে তৈরি হয়। বলা যায়, অন্য অর্থে প্রকরণ হ'ল প্রকৃষ্ট রূপে যে শিল্প তার শিল্পীত রূপ পায়, সে শিল্পই প্রকৃত শিল্প। প্রকরণ বিন্যাসে যে শিল্পী যত বেশি পারঙ্গম সাহিত্য জগতে তিনি তত বেশি আদরণীয় ও অবিস্মরণীয়। উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্যের প্রকরণ বিন্যাস ও বিচার সম্পর্কে এবার দৃকপাত করা যাক।

শরদিন্দুর ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্যের নির্মাণ-শিল্প বা প্রকরণ বিন্যাসের কৌশলগত দিকটি অন্যান্য ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্যের প্রকরণ বিন্যাসের থেকে আলাদা। প্রকরণ বিন্যাসের বিচারে দৃষ্টি কোণ (focalization), সময় বা কাল (time), পরিবেশ-পটভূমি (setting or milieu), আখ্যান (plot), চরিত্র (character) ও ভাষা (language) ইত্যাদি বিষয়গুলি আলোচিত হয়। শরদিন্দুর ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্যের প্রকরণ-বিন্যাস বিচারে অনিবার্যভাবে উপরোক্ত উপাদানগুলির ব্যাখ্যা ও বিচার অত্যন্ত জরুরি।

প্রসঙ্গত, উক্ত বিষয়গুলি কীভাবে শরদিন্দুর ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্যে ব্যবহৃত হয়েছে তার বিচার ও বিশ্লেষণ করা যাক।

দৃষ্টিভঙ্গি বা নিরীক্ষণ (point of view or focalization) উপন্যাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। শুধু বহিঃরঙ্গ উপাদান নয়; অন্তরঙ্গ উপাদান হিসেবে উপন্যাসের রচনা রীতির স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত করে। এককথায় তা উপন্যাস ও ছোটগল্পের তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। লেখক কিংবা কথক কীভাবে, কোন পদ্ধতিতে আখ্যান কিংবা কাহিনি পরিবেশন করতে চান তা আমরা দৃষ্টি কোণের মাধ্যমে জানতে পারি। গল্পের সঙ্গে কথকের বা লেখকের সম্পর্ক কেমন হবে বা পাঠকের সঙ্গে কথকের বা লেখকের সম্পর্ক কীভাবে গড়ে উঠবে তা ঠিক করে দেয় এই দৃষ্টিভঙ্গি বা নিরীক্ষণ নামক উপাদানটি। নিরীক্ষক নিরীক্ষণ করেন। সেটা কার চোখ দিয়ে কীভাবে নিরীক্ষণ করবেন তা

লেখকই ঠিক করবেন। কখনো প্রধান চরিত্র, কখনো অপ্রধান চরিত্র, কখনো কথক, কখনো বা স্বয়ং লেখকই একাজটি করে থাকেন। নায়ক-নায়িকাও হতে পারে; তবে এর কোনো পূর্বশর্ত নেই। এই দৃষ্টিকোণ ব্যবহারের ফলে উপন্যাস ও ছোটগল্পের স্বতন্ত্র প্রেক্ষিত গড়ে ওঠে। সে প্রেক্ষিত কখনো অন্তঃপ্রেক্ষিত আবার কখনো বা বহিঃপ্রেক্ষিত। আবার প্রেক্ষিত অনুসারে কথনের রীতি গড়ে ওঠে। এই রীতি সাধারণত তিন ধরনের। যথা—ক. সর্বজ্ঞকথন পরিস্থিতি (authorial narrative situation or omniscient point of view), খ. আত্মকথন পরিস্থিতি (first person narrative situation) ও গ. ভূমিকানুগ কথন পরিস্থিতি (figural narrative situation)। এককথায় প্রথম পুরুষ বাচক বা সর্বজ্ঞ কথনভঙ্গি, উত্তমপুরুষ বাচক কথনভঙ্গিও ভূমিকানুগ কথনভঙ্গি। আবার কদাচিৎ মধ্যম পুরুষ বাচক কথনভঙ্গিও লক্ষণীয়। তবে ভূমিকানুগ কথন ভঙ্গি অন্তঃপ্রেক্ষিত কিংবা বহিঃপ্রেক্ষিতও হতে পারে। অর্থাৎ লেখক বা কথক কাহিনি তলের বাইরে থেকে অন্তঃপ্রেক্ষিত তৈরি করে। মধ্যমপুরুষ বাচক রীতি খুব কম লেখকই অনুসরণ করেছেন। তিন-চার দশকের লেখক সন্তোষকুমার ঘোষের ‘রেণু তোমার মন’ উপন্যাসটি মধ্যমপুরুষ বাচক কথন পরিস্থিতি আশ্রয়ে রচিত। আত্মকথন রীতির উপন্যাস বুদ্ধিদীপ্ত মননের পরিচয় বহন করে। আত্মকথন রীতির উপন্যাসের দাবি মস্তিষ্কে; হৃদয়ে নয়। এই রীতির আশ্রয়ে অনেক কালোত্তীর্ণ উপন্যাস ও ছোটগল্প রচিত হয়েছে। তবুও সর্বজ্ঞকথন রীতিটিই বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যেও এই রীতিকে অবলম্বন করে লেখকরা প্রচুর উপন্যাস ও ছোটগল্প রচনা করেছেন।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্যের প্রকরণ বিন্যাসের কথায় দৃষ্টিকোণ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মূলত এই উপাদানের যথাযথ ব্যবহারের ফলে তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্পের প্রকরণ রীতির প্রেক্ষিত হয়ে উঠেছে তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথাসম্মত উপায়ে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্যে সর্বজ্ঞকথন পরিস্থিতি অনুসারে কথন তৈরি করেছেন। কখনো লেখক স্বয়ং আবার কখনো বা কথক চরিত্রের মাধ্যমে কথনবস্তু তৈরি করেছেন। অনেকক্ষেত্রে এই রীতি অনুসরণ করে লেখক বা কথক পাঠকের অনেক কাছাকাছি এসেছেন। গল্প শুনিয়েছেন। বিশেষ করে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতিহাসমূলক উপন্যাস ও ছোটগল্পের কথক পাঠক-শ্রোতাকে আন্তরিকভাবে অনেকটা নাছোড়বান্দা হয়ে গল্প শুনিয়েছেন। ‘কালের মন্দিরা’ উপন্যাসের বৃদ্ধ মোড় তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। লেখক প্রথমে মোড়ের পরিচয় দিয়ে গল্প শুরু করলেও মোড় শ্রোতাকে গল্প শুনিয়েছেন। পরবর্তীকালে লেখকই কথকের ভূমিকা নেন বলা যায়, পরিবর্তমান দৃষ্টিকোণের আশ্রয়ে ‘কালের মন্দিরা’র প্রেক্ষিত রচিত যেমন—“বৃদ্ধ হূণ-যোদ্ধা মোড় গল্প বলিতেছিল। নির্জন বন পথের পাশে ক্ষুদ্র একটি জলসত্র; এই সত্রের প্রপাশালিকা যুবতী অদূরে

বসিয়া করলগ্ন কপোলে মোঙের গল্প শুনিতেছিল।” (শরদিন্দু অম্নিবাস, তৃতীয় খণ্ড, ঐতিহাসিক উপন্যাস, পৃ. ১৩।)

আবার মোঙের কথায়—“সেই কথাই তো বলিতেছি। কিন্তু কেন এমন হইল? দ্বাদশ সহস্র শোণিত-লোলুপ মরু-সিংহ পাঁচিশ বৎসর পূর্বে এদেশে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহারা আজ কোথায়? ভেড়া-সব ভেড়া।” (তদেব) এই ধরণের প্রকরণ বিন্যাস আখ্যানের সংলাপকেও নাট্যধর্মী করে তোলে। কথক হয়ে ওঠেন নাট্য গুণে অধিকারী। (dramatised narrator) ‘গৌড়মল্লার’ ‘তুমি সন্ধ্যার মেঘ’, ‘কুমার সম্ভবের কবি’, ‘তুঙ্গভদ্রার তীরে’, ‘ঝিন্দের বন্দী’ ও ‘বহুযুগের ওপার হতে’ প্রভৃতি উপন্যাসের কথন রীতি মূলত একই জাতীয়। আবার আত্মকথন রীতির আশ্রয়ে তিনি ইতিহাসাশ্রিত জাতিস্মর ধারার গল্পগুলির কথনশৈলী রচনা করেছেন। ‘অমিতাভ’, ‘বিষকন্যা’, ‘সেতু’, ‘রুমাহরণ’, ‘রক্ত-সন্ধ্যা’ ও ‘মৎপ্রদীপ’ প্রভৃতি গল্পগুলি উত্তম পুরুষের জবানীতে বর্ণিত হয়েছে। আত্মকথন রীতির শর্তানুসারী কথন বর্ণিত হওয়ায় গল্পগুলি বহুগুণীত হয়ে উঠেছে। যেমন—“সে মূর্তির দিকে তাকাইয়া আমার প্রাণের মধ্যে একটি শব্দ কেবল রণিত হইতে লাগিল— ‘অমিতাভ’, ‘অমিতাভ’।” (শরদিন্দু অম্নিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, ছোটগল্প, পৃ. ২৮।)

বাংলা ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস-ছোটগল্পের কথা বলুন আর অন্যান্য প্রকরণ-আশ্রয়ী উপন্যাস-ছোটগল্পের কথা বলুন মধ্যম পুরুষবাচক কথনরীতির উদাহরণ খুব বেশি একটা চোখে পড়ে না। উল্লেখ্য, সন্তোষকুমার ঘোষের ‘রেণু তোমার মন’ উপন্যাসটি মধ্যম পুরুষ বাচক কথনশ্রয়ী। শুধুমাত্র ‘সেতু’ ইতিহাসমূলক-জাতিস্মর ধারার ছোটগল্পটির কথনে দু’একটি জায়গায় মধ্যম পুরুষবাচক কথনশৈলীর পরিচয় পাই। যেমন—“লিখে রাখ, ওরা চৈত্র রাত্রি ১টা ১৭ মিনিটে জন্ম।” (শরদিন্দু অম্নিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, ছোটগল্প, পৃ. ১৯৯।) প্রসঙ্গত, আখ্যান নির্মাণ কৌশল প্রসঙ্গে উক্ত তিন ধরণের কথনরীতি সম্পর্কে আলোচনার অবকাশ রয়েছে। আখ্যান সম্পর্কে সমালোচকদের ভিন্ন ভিন্ন আলোচনা মাথায় রেখেও বিষয়টি পর্যালোচনা করা হয়েছে।

ডিসকোর্স (discourse) বা বাচনের উপাদানগুলির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হ’ল সময় (time) যা আখ্যান (বাচন)-এর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। সময় বা কালই নির্ণয় করে দেয় আখ্যানের গতিবিধি। সে উপন্যাসেরই হোক বা ছোটগল্পের। সময়ের ধর্ম একমুখী। নিরন্তর ছুটে চলাই তার ধর্ম। কথায় বলে—সময় কারও জন্য অপেক্ষা করে না। উপন্যাস ও ছোটগল্পে মূলত দু’ভাবে সময়ের স্থিতি ধরা হয়। যদিও একেকজন একেকভাবে এই সময়কে ব্যবহার করে থাকেন, দুই বা ততোধিক dimension-এ (বহুমাত্রিক)। যথা এক. গল্পের বা কাহিনির সময় ও দুই. লেখকের বলার বা রচনার সময়। সময় বাচনের উপাদানগুলির যথাযথ পরিস্ফুটনের ক্ষেত্রে নির্ণায়ক

উপাদান। প্রধানত চরিত্রের অন্তর্ভাব প্রকটনে সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এককথায় চরিত্রগুলির অন্তঃরঙ্গ ও বহিঃরঙ্গ উভয় বৈশিষ্ট্যই উজ্জ্বলতা পায় সময়ের অভিঘাতে। আখ্যানও হয়ে ওঠে কংক্রিট। আবার সময়ের শিথিলতায় আখ্যানও শিথিল বিন্যস্ত হয়। অর্থাৎ সময়ের এলোমেলো বিন্যাসে আখ্যান গঠন-বিন্যাস পৃথুল হয়ে পড়ে। পাঠকের উৎকর্ষা, সন্দেহ সংশয়, কৌতুহল সময়ের পশ্চাৎ-উদ্ভাস ও পূর্ব-উদ্ভাসের মাধ্যমে বেড়ে ওঠে। কোন চরিত্র, কতটুকু সময় ধরে ভূমিকা পালন করবে তারও নির্ণায়ক এই সময়। পৌনঃপুনিকতা কীভাবে উপন্যাসে ও ছোটগল্পের আখ্যানে ব্যবহৃত হবে তাও-ও সময়ের বিন্যাসে নির্ধারিত হয়। অর্থাৎ লেখককে সময় সম্পর্কে সদা সতর্ক থাকতে হয়। সময়ের বিভ্রান্তি হলেই আখ্যানে কালানৌচিত্ত (anachronism) দোষ দেখা দেবে। Ronen, Ruth -এর কথায়—“The narrative time line is not one monolithic sequence : the time line is segmented into a foreground and background or into a narrative present and a nonpresent;” (আখ্যানতত্ত্ব, অমিতাভ দাস, পৃ. ৩৪।)

পাশাপাশি ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্যে সময় বা কালের ব্যবহার হয় একটু অন্যভাবে। লেখককে এক্ষেত্রে বাড়তি কৌশল গ্রহণ করতে হয় এবং দূর কালের পটভূমিকে বা অতীতের পটভূমিকে বর্তমানের নিরীক্ষণে পাঠকের বিশ্বাস ও বাস্তবতাবোধ জাগানোর দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকতে হয়। দ্বি-স্তরীয় সময় বিন্যাসের রূপটি এতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ঐতিহাসিক সময় ও বর্তমানের সময়ের মধ্যে সেতু তৈরি করে এ জাতীয় আখ্যান রচনা করেন একজন লেখক। প্রধানত দু’টি শর্ত লেখককে মাথায় রেখে এ ধরনের বাচন বা আখ্যানশৈলী রচনা করতে হয়। এক. ইতিহাস প্রতীতি ও দুই. বাস্তবতাবোধ। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস ও ছোটগল্পগুলি মূলত উক্ত শর্তেই রচিত। ‘কালের মন্দির’ উপন্যাসটি মূলত বারো বছর পূর্বে লেখা শুরু হলেও দীর্ঘদিন পড়ে থাকবার পর পুনরায় লেখা শুরু করেন। সময়ের ব্যবধানে লেখকের মানসিকতা বদলাতেই পারে। অনেকসময় বদলায়ও। কিন্তু চিন্তার সূক্ষ্ম নৈপুণ্যতায় লেখকের মানসিকতা বদলায়নি। উল্লেখ্য উপন্যাসটির পটভূমি ভারতবর্ষে হুণ আক্রমণের ইতিহাস। সেই সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের প্রতি লেখকের অনুরাগ বৌদ্ধ যুগকেই চিহ্নিত করায়। সর্বোপরি লেখকের রচনাকালের সঙ্গে মিলিয়ে এক বাস্তবধর্মী আখ্যান জন্ম নিয়েছে এবং রোমান্স, কল্পনাচারিতাকে ছাপিয়ে মানুষের বিশ্বস্থ হয়ে উঠেছে। ‘গৌড়মল্লার’, ‘কুমারসম্ভবের কবি’, ‘তুমি সন্ধ্যার মেঘ’ ও ‘তুঙ্গভদ্রার তীরে’ উপন্যাসগুলিতেও ইতিহাসের প্রেক্ষিতে সময় বিন্যস্ত হয়েছে। দ্বি-স্তরীয় সময়-বিন্যাসের ফলে উপন্যাসগুলির অন্যান্য উপাদানগুলিও অত্যন্ত শিল্পীত রূপ পেয়েছে। এককথায়

উপন্যাসের যাবতীয় উপাদান সময়ের গণ্ডিতে আবদ্ধ; অবিচ্ছেদ্যভাবে উপস্থাপিত।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতিহাসাশ্রিত ছোটগল্পগুলিও দূরকালের ও নিকট অতীতের প্রেক্ষাপটে নির্মিত। ‘ইন্দ্রতুলক’ গল্পটির পটভূমি মূলত আর্যদের আগমনের পূর্বকাল। অনির্দেশ্য ও প্রাগৈতিহাসিক কাল ‘রুমাহরণ’ গল্পটির পটভূমি। প্রাচীন মিশরের ইতিহাস বর্ণিত গল্প ‘আদিম’ ইত্যাদি। এর থেকে স্পষ্ট ধারণা নেওয়া যায় যে, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কখনবিশ্ব মূলত সময়ের সুচিহ্নিত বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে অর্থে উপন্যাসে, ছোটগল্পে সময়ের বিন্যাস দেখিয়েছেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় সে পথে অনেকটা হেঁটেও নিজের জগতকে আলাদা করে নিয়েছেন। তাঁর সময়চেতনা আরও গভীর আরও অন্তর্বাহী (inward)। কয়েক হাজার পূর্বেকার ঘটনা চরিত্র ও পরিবেশকে উপস্থাপন করে বাস্তবমুখী ও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে তাঁর জুড়ি বাংলা সাহিত্যে মেলানো ভার। সুদূর অতীত ও বর্তমানের সংযোগ সূত্রের কৌশলপণার দিকটি শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতিহাসাশ্রিত লেখাগুলিতে স্পষ্ট—“ঘরের কোণে বসিয়া লিখিতেছি, আর ধূম্র-কুণ্ডলীর মতো বর্তমান জগৎ আমার সম্মুখ হইতে মিলিয়া যাইতেছে। আর একটি মায়াময় জগৎ ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছে। আড়াই হাজার বৎসর পূর্বের এক স্বপ্ন দেখিতেছি।” (শরদিন্দু অমনিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, ছোটগল্প, ‘অমিতাভ’, পৃ. ১৭) Georg Lukacs -এর ‘The Historical Novel’ বইটিতে ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসের সময়-বিন্যাস, পরিবেশ-বিন্যাস সমাজ, বিন্যাসও চরিত্র-বিন্যাসের বিষয়টি অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে—“It drew the attention of writers to the concrete (i.e., historical) significance of time and place, to social condition and so on, it created the realistic, literary means of expression for portraying this spatiotemporal (i.e. historical) character of people and circumstances.” (Georg Lukacs, The Historical Novel, Translated from the German by Hannah and Stanley Mitchell, p. 18)

কথাসাহিত্যের সংস্থান বা পরিবেশ-বিন্যাস (setting or milieu) অত্যন্ত জরুরি উপাদান। সংস্থান বিষয়টি স্থান-কাল-চরিত্র, আখ্যান ও ভাষা কিংবা সংলাপের সঙ্গে অন্তর্বাহী সম্পর্কে জড়িত। উক্ত বিষয়-আশয়ের অবস্থানের রূপটিও দিক নির্দেশ করে। অনেকে আবার প্রতিবেশকে গুরুত্ব দিতে নারাজ (ইংরেজ ঔপন্যাসিক জেন অস্টেন, সূত্র - গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, রবীন্দ্র উপন্যাসের নির্মাণ শিল্প, পৃ. ৫২) বিপরীত ক্রমে আবার টমাস হার্ডির নাম উল্লেখযোগ্য। লেখাগুলিতে পরিবেশ বিষয়টি অত্যন্ত উজ্জ্বল রূপে চিত্রিত। বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্পের মূলেও কিন্তু সংস্থান বা প্রতিবেশের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিবেশ না থাকলে চরিত্র বলুন আর

ভাষা সংলাপ বলুন উভয়ই মৃত। কারণ বিষয়ানুসারী পরিবেশানুসারী আখ্যান জন্ম না নিলে সে আখ্যান কালজয়ী হয় না। তবে চরিত্রগত মনস্তত্ত্বমূলক কিছু কিছু উপন্যাসে ও ছোটগল্পে পরিবেশ বিষয়টি কিছুটা অনুজ্জ্বল। তথাপি এ জাতীয় লেখায় পরিবেশকে উপেক্ষা করা যায়। পারিবারিক পটভূমিটাই সেখানে লক্ষ্য। নৈসর্গিক পরিবেশ, রাজনৈতিক পরিবেশ, ঐতিহাসিক পরিবেশ, আঞ্চলিক ও সামাজিক পরিবেশ ভিন্ন ভিন্ন মেজাজের আখ্যান জন্ম দেয়। ফলে লেখক নিজেই তা ঠিক করে নেন কোন পরিবেশের মাধ্যমে আখ্যান রচনা করতে চান। পরিবেশগত ভিন্নতার কারণেই কথাসাহিত্যের আখ্যানও স্বতন্ত্র রূপ পায়। সচেতন লেখক মাত্রই জানেন কোনো একটি ঘটনা, চরিত্রকে সাংকেতিক ব্যঞ্জনা বা রূপকের আশ্রয় প্রকাশ করতে গেলে পরিবেশ বা সংস্থানের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। ব্যঞ্জনা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে পরিবেশ পরিস্থিতি। যেমন—শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘বিষকন্যা’ গল্পে মত্ত হস্তী পুষ্করের উন্মত্ত অবস্থার প্রকাশ ঘটাতে প্রতীকী রূপকে অবলম্বন করেছেন—“ সেনজিৎ সভাচত্র হইতে অবতরণ করিয়া হস্তীর আরও নিকটবর্তী হইলেন। মদস্রাবী মাতঙ্গ প্রহার-উদ্যমে শুণ্ড উর্ধ্ব তুলিল। তখন সেই রুদ্ধশ্বাস নীরবতার মধ্যে সেনজিৎ মৃদু ভর্ৎসনার সুরে বলিলেন—‘পুষ্কর! পুষ্কর!’

পুষ্করের শুণ্ড ঘোরবেগে অবতরণ করিতে করিতে অর্ধ-পথে থামিয়া গেল। মত্ত হস্তী রক্তনেত্রে মহারাজের দিকে চাহিয়া যেন বিদ্রোহ করিতে চাহিল, একবার দ্বিধা ভরে তাহার করদণ্ড ঈষৎ আন্দোলিত হইল—তারপর ধীরে ধীরে শুণ্ড অবনমিত করিয়া সে নম্রভাবে দাঁড়াইল। কয়েক মুহূর্ত মধ্যে ধবংসের মূর্তিমান বিগ্রহ যেন শান্তিময় তপোবন মৃগে পরিণত হইল।” (শরদিন্দু অম্নিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, ছোটগল্প, পৃ. ১৬২-১৬৩)

তাঁর অন্যান্য উপন্যাস ও ছোটগল্পেও এ জাতীয় প্রতীকী ব্যঞ্জনার ছাপ বর্তমান। বিশেষ করে ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্যে এই বিষয় অত্যন্ত প্রাণবন্ত। বিশেষ করে অতীত যুগের চিত্র, মধ্যযুগের চালচিত্র অঙ্কনে লেখককে সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। পরিবেশের যথাযথ পরিস্ফুটনে এ জাতীয় উপন্যাস বা ছোটগল্প শিল্পীত রূপ পায়। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় এ ব্যাপারে স্বয়ং জানিয়েছেন—“প্রকৃতির বর্ণনা কোথাও দশ পংক্তির বেশি করিবে না। যাহা সকলেই দেখিতে পায় তাহার দীর্ঘ বর্ণনা ক্লাস্তিকর। বর্ণনীয় বিষয়ের চিত্রটি স্পষ্টভাবে মনের পটে আঁকা না থাকিলে বর্ণনা অস্পষ্ট হইবে। প্রত্যেক দৃশ্যটি visualise করিবে।” (শরদিন্দু অম্নিবাস, দ্বাদশ খণ্ড, অসঙ্কলিত রচনা, লেখকের আদর্শ, পৃ. ২৩৮)

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবেশ সৃজনে মুনশিয়ানা দেখিয়েছেন। তাঁর ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্য তার প্রমাণ। পরিবেশ বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি দশ পংক্তির বেশি বর্ণনা করেন নি। নির্দিষ্ট

পংক্তির মাধ্যমেই পরিবেশানুসারী আখ্যান তৈরি করেছেন। উপন্যাস ও ছোটগল্পের বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই সংস্থান বা প্রতিবেশ-বিন্যাসে তিনি মনোযোগী। বলা যায় প্রতিবেশ-পরিস্থিতি বর্ণনা তাঁর ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্যের প্রাণ। কেননা প্রতিবেশ বিন্যাস উপযোগী না হলে লেখকের বর্ণনীয় বিষয় জীবন্ত হয়ে ওঠে না।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের নৈসর্গিক বর্ণনায় এমনকি ঐতিহাসিক যুগের নৃতাত্ত্বিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, ধর্মনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার বর্ণনায় কোথাও লেখক অতিরঞ্জিত বর্ণনা করেন নি। এছাড়াও মোগল অন্তঃপুর, মোগল রঙমহাল এবং মধ্যযুগের চালচিত্র অঙ্কনেও যুগপোযোগী পরিবেশ-বিন্যাসে তাঁর নৈপুণ্যের স্বাক্ষর বর্তমান। ঐতিহাসিক বিষয় ও অনৈতিহাসিক বিসয়ের পরিবেশ বিন্যাসে তিনি সচেতন ছিলেন। ফলে তাঁর ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস ও ছোটগল্পগুলি পাঠে আমাদের ক্লাস্তি আসে না বরং কাহিনির দুর্দান্ত আকর্ষণ আমাদের আদ্যন্ত ধরে রাখে। উল্লেখ্য, “রাজপুরীর সাত শত প্রতিহারিণী ও পরিচারিকা সভাগৃহের সম্মুখে সারি দিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাদের বাম হস্তে চর্ম, দক্ষিণ হস্তে মুক্ত তরবারি। সকলেই দৃঢ়স্বী যুবতী, সুদর্শনা। তাহাদের মধ্যে অল্প সংখ্যক তাতারী যুবতী আছে, পিঙ্গল কেশ ও নীল চক্ষু দেখিয়া চেনা যায়। রাজপুরীতে সভাগৃহ ব্যতীত অন্যত্র পুরুষের প্রবেশ নিষেধ, এই নারী বাহিনী পুরী রক্ষণ করে ও পৌরজনের সেবা করে।” (শরদিন্দু অম্নিবাস, তৃতীয় খণ্ড, ঐতিহাসিক উপন্যাস, তুঙ্গভদ্রার তীরে, পৃ. ৫২০) এই পরিবেশ বর্ণনায় লেখক তাতারী সৈনিকদের উপস্থাপন ধরে নারী বাহিনীর পুরী রক্ষার বিষয়টি বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছেন। লক্ষণীয়, তাতার সম্প্রদায়ের মানুষজন মূলত এশিয়া এবং ইউরোপে বসবাস করে। তুর্কো-মোগল গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত পুরুষ সেনাদের মতো নারী বাহিনীও সমান দক্ষ। অশ্বপৃষ্ঠেও তারা যুদ্ধ করতে পারে।

প্রসঙ্গত, লেখক জানিয়েছেন এই উপন্যাসটিতে ঐতিহাসিক চরিত্র ও ঘটনার বর্ণনা থাকলেও কাহিনিটি কল্পিত কিংবা মৌলিক। কাহিনিটির সময়কাল মূলত ১৪৩০ খ্রিস্টাব্দের আশে পাশে। তখনও বিজয়নগর রাজ্যের অবসান থেকে একশ বছর বাকি ছিল। অর্থাৎ মধ্যযুগের পরিবেশের উপস্থাপনায় এ জাতীয় বর্ণনা অত্যন্ত উপযোগী ও প্রাসঙ্গিক। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যান্য ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস ও ছোটগল্পেও একই চিত্র বিদ্যমান। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ইতিহাসাশ্রিত রোমাঞ্চ রচনাগুলি সম্পর্কে তাঁর স্পষ্ট ধারণা থাকার কারণেই তিনি নিজস্ব একটা জগৎ তৈরি করেছেন। ফলে তাঁর এ জাতীয় রচনায় পরিমিত পরিবেশ-বিন্যাস সহ অন্যান্য বাচনিক উপাদানগুলি বিষয় উপযোগী হয়ে উঠেছে।

প্রকরণ বিচারে শরদিন্দুবাবু যে অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন তা তাঁর সৃষ্ট ইতিহাসাশ্রিত

কথাসাহিত্যগুলি পাঠে স্পষ্টভাবে জানা যায়। লেখকদের জনপ্রিয় সর্বজ্ঞকথন রীতিকে আদর্শ করে তিনি তাঁর রচনাগুলির প্রাতিস্বিকতা বজায় রেখেছেন—এতেই তাঁর মৌলিকতা ও সাহিত্যিক মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। কথাসাহিত্য মূলত উপন্যাস ও ছোটগল্পের জগৎ নিয়ে তৈরি। উভয়ের মধ্যে কিছু কিছু প্রাকরণিক যোগ থাকলেও বৈসাদৃশ্যও বেশী চোখে পড়ে। উভয়ের প্রাণ কথা হলেও সাহিত্য পদবাচ্য হিসেবে কথার স্ফূরণ সম্পূর্ণ আলাদা। সুতরাং উভয় শাখার পৃথক পৃথক মূল্যায়ন জরুরী হয়ে ওঠে। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যের মূল্যায়নে সেই পথেই হাঁটা আবশ্যিক।

দৃষ্টিভঙ্গি, সময়, পরিবেশ, আখ্যান, চরিত্র ও ভাষা ইত্যাদি উপাদান বিন্যাসের ওপর ছোটগল্পের সার্থকতা নির্ভর করে। পরিমিত ভাষাবোধ ও তার ব্যবহারও যথোপযুক্ত হওয়া চাই। কারণ ছোটগল্পে ভাষার ব্যবহারের ক্ষেত্রে একজন ছোটগল্পকারকে সতর্ক থাকতে হয়। পরিমিত ভাষাবোধ, অনাবশ্যিক বাহুল্যবর্জন, ঋজু, সরল, একমুখী ভাষাই ছোটগল্পের উপজীব্য। ছোটগল্পের কাহিনি-নির্মাণে লেখকের স্বাধীনতা যেহেতু কম সেহেতু গল্পকারকে স্বল্প পরিসরে খণ্ড-খণ্ড প্রতীতির মধ্যে দিয়ে জীবনের সামগ্রিক ছবি আঁকতে হয়। অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত কাহিনি স্বল্প পরিসরে ছোটগল্পের শর্ত পূরণ করে। তবে বাংলা সাহিত্যে বৃহৎ পরিসরের ছোটগল্পে সংখ্যাও কম নয়। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ও ছোটগল্পের সংকীর্ণ পরিসর থেকে বেরিয়ে এসে বৃহৎ পরিসরে অনেকগুলি ছোটগল্প লিখেছেন। তিরিশের দশকের কথাকার শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ও সেই রীতিই অনুসরণ করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে তিনি সর্বাধিক সফলতাও পেয়েছেন। ‘শঙ্খ-কঙ্কণ’, ‘বিষকন্যা’ ইত্যাদি গল্পগুলি তার দৃষ্টান্ত। এই গল্প দু’টিতে তিনি ছোটগল্পের প্রচলিত রীতিকে ছাপিয়ে গেছেন। তবুও তাঁর এই গল্প দু’টি রমণীয়তার উৎকর্ষ লাভ করেছেন। রস-সৃষ্টিই যেহেতু তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য সেহেতু তিনি গল্পের আয়তন রচনার বিধিবদ্ধ নিয়ম-নীতির ধার ধারেন নি।

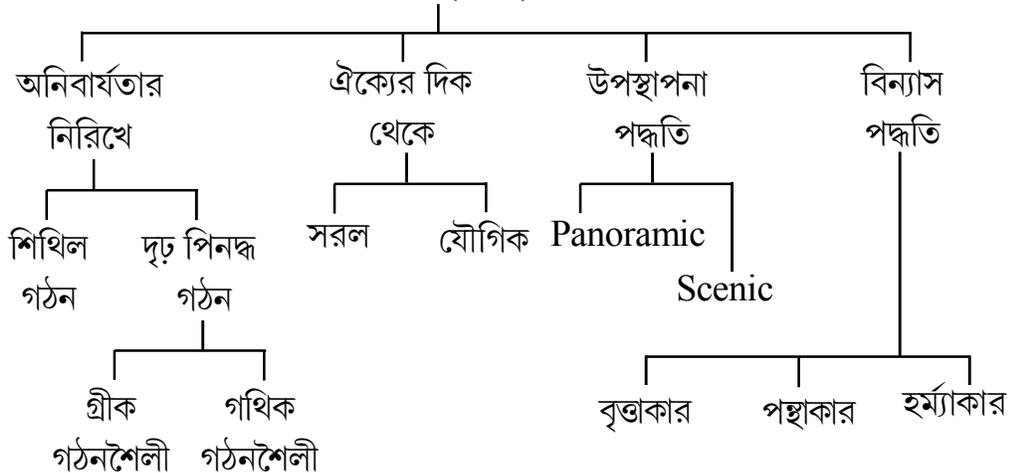
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতিহাসাশ্রিত ছোটগল্পগুলি ইতিহাসের তথ্য ও সত্যের সঙ্গে কল্পনার মিশ্রণে তৈরি। এক-একটি অভিনব কল্পলোক। এই অভিনব কল্প জগতে প্রবেশে দু’ধরণের পস্থা অবলম্বন করেছেন। এক. ইতিহাস, দুই. জাতিস্মরতা। ‘শরদিন্দু অমনিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, ছোটগল্প বইটিতে মোট সতেরেটি ইতিহাসাশ্রিত ছোটগল্প পাই। ‘ইন্দ্রতুলক’, ‘প্রাগ্জ্যোতিষ’, ‘আদিম’, ‘অষ্টম সর্গ’, ‘মরু ও সঙঘ’, ‘শঙ্খ-কঙ্কণ’, ‘রেবা রোধসি’, ‘চুয়াচন্দন’, ‘বাঘের বাচ্চা’, ‘তক্ত মোবারক’ ও ‘চন্দন-মূর্তি’ প্রভৃতি গল্পগুলি বিশুদ্ধ ইতিহাসের উপাদানে রচিত। আর ‘রুমাহরণ’, ‘অমিতাভ’, ‘বিষকন্যা’, ‘সেতু’, ‘মৃৎপ্রদীপ’ ও ‘রক্ত-সন্ধ্যা’ প্রভৃতি গল্পে ইতিহাসের পটভূমিকায়

জাতিস্মরমূলক প্রকরণ-কৌশলের আশ্রয়ে রচিত।

ইতিহাসের ঘটনা, চরিত্র, প্রতিবেশ, অতীতযুগের জীবনযাত্রা ও প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর ইতিহাসাশ্রিত ছোটগল্পগুলির কথাবস্তুতে। উঠে এসেছে অতীত ইতিহাসের মায়াময় জগতের সঙ্গে বাস্তব জগতের পটভূমির মিশ্রণে গল্পগুলির কাহিনি বিন্যস্ত হয়েছে। অতীতের রোমান্স, অতীতের আলো আধারি অধ্যায় প্রাগৈতিহাসিক যুগজীবন শরদিন্দুবাবুর ইতিহাসাশ্রিত ছোটগল্পগুলির বিষয়-আশয়। নিছক ইতিহাসের তথ্যকে পরিবেশন না করে তথ্যকে অবিকৃত রেখে ইতিহাসের অস্পষ্টতাকে কাজে লাগিয়েছেন। অতীতকে উজ্জ্বল করে তুলতে ধ্রুপদী যুগের গাভীর্যপূর্ণ ভাষার আশ্রয় নিয়েছেন। ‘ইন্দ্রতুলক’, ‘আদিম’, ‘প্রাগজ্যোতিষ’, ‘অষ্টম সর্গ’ প্রভৃতি ইতিহাসাশ্রিত ছোটগল্পগুলি তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

নাটক মূলত মিশ্রকলা। নাটকের শরীর সংলাপ দিয়ে তৈরি। সংলাপ নাটকের প্রাণ। সংলাপ দিয়ে নাটকের কথার শরীর গড়ে ওঠে। অভিনয় কিংবা মঞ্চ প্রযোজনা দৃশ্যের জন্ম দেয়। নাটক পিয়াসী মানুষের দেখার চাহিদা পূরণ করে। ফলে নাটক হয়ে ওঠে অভিনয় নির্ভর শিল্পকলা। যাকে আবার বলতে পারি নাট্যকলা। কিন্তু কথাসাহিত্যের আখ্যানকে হতে হয় কথন নির্ভর; কথন মুখ্য। নাটকে অভিনেতার মাধ্যমে বার্তা প্রেরণ করা হয়। আর উপন্যাস ও ছোটগল্পের আখ্যানে কথক তার অভিজ্ঞতা পাঠক-শ্রোতাকে জানাতে চায়। এতে উভয়ের মধ্যে একটি মাধ্যম তৈরি হয়। তৈরি হয় একধরনের যোগাযোগ সূত্রে কথন-রীতি বা কথন পরিস্থিতি। তিনটি উপায়ে এই কথক-পাঠক-শ্রোতার সম্পর্ক তৈরি হয়। আমরা তা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। অমিতাভ দাস তাঁর ‘আখ্যানতত্ত্ব’ (পৃ. ৬৭) গ্রন্থে আখ্যান-সমালোচক Stanzel-এর অনুসরণে তা দেখিয়েছেন। আবার অলোক রায় সম্পাদিত ‘সাহিত্যকোষ : কথাসাহিত্য’ (পৃ. ১৪৯) গ্রন্থে শ্যামাপ্রসাদ সরদার প্লটের স্বরূপ ও লক্ষণ চিহ্নিত করতে ফোর্ড ম্যাডক্স ফোর্ড (১৮৭৩-১৯৩৯) -এর অনুসরণে চার ধরনের স্বরূপ খুঁজে পেয়েছেন। সারণির সাহায্যে তা উল্লেখ করা হ’ল—

প্লট (Plot)



প্রসঙ্গত, E.M. Forster তাঁর ‘Aspects of the Novel’ গ্রন্থে Plot সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা উল্লেখ্য— “We have defined a story as a narrative of events arranged in their time-sequence. A plot is also a narrative of events, the emphasis falling on causality. 'The king died and then the queen died' is a story the king died, and then the queen died of grief' is a plot.” (p. 75.) পাশাপাশি অমিতাভ দাসের ‘আখ্যানতত্ত্ব’ গ্রন্থে প্রপ, তোমাশেভক্ষি, বাঁভেনিস্ত, রোলাঁ বার্ত চ্যাটম্যানের প্রসঙ্গ সূত্রে আখ্যান সম্পর্কে কিছু কিছু পরিভাষার পরিচয় পাওয়া যায়। যথাক্রমে—Fabula, Sjuzhet, historie, discourse/recit, story, discourse প্রভৃতি। তবে আখ্যান সম্পর্কে discourse শব্দটিকেই অনেকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। অনেকগুলো উপাদানের ক্রমবিন্যাস যখন কার্যকারণ সূত্রে ও যুক্তির নিরিখে বর্ণিত হয় তখনই কিন্তু discourse-এর জন্ম হয়। আবার এই discourse-ও অনেক সময় বাচন অর্থেও ব্যবহৃত হতে দেখি। বাচনের কতগুলি উপাদানও রয়েছে। যেমন—কাল/সময়, নিরীক্ষণ, কথন, চরিত্রায়ণ, সংস্থান ইত্যাদি। এভাবেই একটি কাহিনি বা ঘটনাক্রম পরম্পরায় আখ্যানের রূপ পায়।

অন্যদিকে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর ‘সাহিত্য ছোটগল্প’ (পৃ. ১৯০) গ্রন্থে ছোটগল্পের নির্মাণ-কৌশল প্রসঙ্গ সমাপ্তির বিষয়টিও দু’টি পদ্ধতিতে আলোচনা করেছেন। যেমন— ক. অপ্রত্যাশিত চমক (whip-crack ending), খ. ধীর স্বাভাবিক পরিণাম। পো, মপাশাঁ এবং ও. হেনরি অপ্রত্যাশিত চমকের সৃষ্টিতে আগ্রহী। আর একদল রয়েছেন যাঁরা এই অপ্রত্যাশিত চমক সৃষ্টিকে পছন্দ করেন না। তাঁরা হলেন চেকভ, হেনরি জেমস প্রমুখ। ধীর স্বাভাবিক পরিণতিই এদের কাম্য। বলা যায়, সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আলো যেমন ধীরে ধীরে বিকেলে গড়িয়ে পড়ে ঠিক তেমনি ছোটগল্পের সমাপ্তি হওয়া উচিত বলে মনে করেন এই গোষ্ঠীর লেখকগণ। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় এই দু’ধরনের পদ্ধতিকেই গ্রহণ করেছে। ‘অমিতাভ’, ‘বিষকন্যা’, ‘মৃৎপ্রদীপ’, ‘শঙ্খ-কঙ্কণ’ ও ‘রক্ত-সন্ধ্যা’ তার প্রমাণ। ‘রক্ত-সন্ধ্যা’ গল্পটি মূলত দ্বিতীয় পদ্ধতিকেই অনুসরণ করায়। আবার ছোটগল্পের গঠন ও বিন্যাসের কথায় তিনটি গঠন পদ্ধতির কথা জানা যায়। আব্দুর রহিম গাজী তাঁর ‘যুগের প্রতিবিশ্ব বাংলা ছোটগল্প’ (পৃ. ১১) সম্পাদিত বইয়ে এই বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। যেমন—

- i) Stair-step Construction বা সোপানারোহ।
- ii) Rocket construction বা চকিতোন্নত গঠন।
- iii) Circular Construction বা ঘূর্ণরেখ গঠন।

বলা যায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতিহাসাশ্রিত গল্পগুলির গঠন ও বিন্যাস মূলত উপরোক্ত তিনটি পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করেছে। পর্যায়ক্রমে তিনটি পদ্ধতির আশ্রয়ে গড়ে ওঠা শরদিন্দুর লেখা তিনটি গল্পের উদাহরণ চয়ন করলেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠবে। যেমন—‘অমিতাভ’, ‘রক্ত-সন্ধ্যা’ ও ‘সেতু’ ইত্যাদি। প্রথমোক্ত সর্বজ্ঞ কথন পরিস্থিতি সর্বস্তরের লেখকের জনপ্রিয় রীতি। এই রীতিকে আশ্রয় করে বহু কালজয়ী সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই রীতিকে অবলম্বন করে উপন্যাস ও ছোটগল্প রচনা করেছেন। কথকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে লেখক চরিত্রগুলির অন্তর্প্রকটনে যত্নবান হন। শরদিন্দুর ‘কালের মন্দিরা’, ‘তুমি সন্ধ্যার মেঘ’ উপন্যাসের মতো ‘অমিতাভ’, ‘মুৎপ্রদীপ’, ‘সেতু’ প্রভৃতি ছোটগল্প উদাহরণ।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘অষ্টম সর্গ’ গল্পের কিছু অংশ উল্লেখে তাঁর পরিচয় ফুটে উঠবে—
 “ঘাট নির্জন। অন্যদিন এই সময় বহু স্নানাথিনীর ভিড় লাগিয়া থাকে; তাহাদের কলহাস্য ও কঙ্কণকিঙ্কিণী মুখরভাবে শিথাকে উপহাস করিতে থাকে; তাহাদের ঘটোচ্ছলিত জল মসৃণ সোপানকে পিচ্ছিল করিয়া তোলে। আজ কিন্তু ভিড় নাই। মাঝে মাঝে দুই একটি তরুণী বধু আকাশের দিকে সশঙ্ক দৃষ্টি হানিয়া ঘট ভরিয়া দ্রুত পদে প্রস্থান করিতেছে। ক্কাচিৎ একঝাঁক কিশোরী বয়স্যা মঞ্জীর বাজাইয়া গাগরী ভরিতে আসিতেছে; তাহারাও অল্পকাল জল ক্রীড়া করিয়া পূর্ণ ঘট কক্ষে চঞ্চল চরণে সোপান আরোহন করিয়া প্রস্থান করিতেছে। নির্জন ঘাটে সন্ধ্যার ছায়া আরও ঘনীভূত হইতেছে।” তদুপরি শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতিহাসাশ্রিত গল্পগুলিতে সংস্কৃত শব্দের ব্যবহারের পাশাপাশি অতৎসম শব্দের ব্যবহার লক্ষণীয়। কেননা ইতিহাসাশ্রিত অতীত যুগের জীবনচিত্রের বর্ণনায় তিনি গুরুগভীর তৎসম আশ্রয় নিয়েছেন। অতীতকে অতীতের স্থান-কাল-পাত্রকে উপস্থাপিত করতে গেলে এ জাতীয় পন্থাই অবলম্বন করা উচিত। শরদিন্দু সেই কাজটিই করেছেন আদর্শ মনে একাজ তিনি সম্পাদন করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যবহৃত ভাষা শরদিন্দুর রচনায় অবলীলায় স্থান পেয়েছে। তা সত্ত্বেও শরদিন্দুর ব্যবহৃত ভাষা পৃথক। ভাষার ব্যবহার সম্পর্কে তাঁর মত এরকম—
 “ভাষা হবে আরবী ঘোড়ার মতন — বেতো ঘোড়ার মতন নয়। শুধু গতিবেগ নয় — ছোট্টার মধ্যেও সৌন্দর্য যেন ফুটে বেরোয় — মন যেন ভরে যায়।” (শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, নিতাই বসু, পৃ. ৭৭) মন্তব্যটির সূত্র ধরে ‘সেতু’ গল্পে প্রকৃতির বর্ণনা সে কথাই স্মরণ করায়— “একবার মাত্র তাহাকে দেখিয়াছি, মদনোৎসবের কঙ্কুম-অরুণিত সায়াছে। উজ্জ্বলিনীর নগর-উদ্যানে মদনোৎসবে যোগ দিয়াছিলাম। একদিনের জন্য প্রবীণতার শাসন শিথিল হইয়া গিয়াছে। অবরোধ নাই, অবগুণ্ঠন নাই — লজ্জা নাই। যৌবনের মহোৎসব। উদ্যানের গাছে গাছে হিন্দোলা দুলিতেছে, গুল্মে গুল্মে চটুল চরণা নাগরিকার মঞ্জীর বাজিতেছে, অসম্বৃত অঞ্চল উড়িতেছে, আসব-অরুণ নেত্র ঢলু ঢলু

হইয়া নিমীলিত হইয়া আসিতেছে। কলহাস্য করিয়া কুঙ্কুম প্রলিপ্তদেহা নাগরী এক তরুণী হইতে গুল্মান্তরে ছুটিয়া পলাইতেছে, মধ্যপথে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পিছু ফিরিয়া চাহিতেছে, আবার পলাইতেছে। পশ্চাতে পুষ্পের ক্রীড়াধনু হস্তে শবরবেশী নায়ক তাহার অনুসরণ করিতেছে। নিভৃত লতানিকুঞ্জে প্রণয়ী মিথুন কানে কানে কথা কহিতেছে। কোনও মৃগ নয়না বিভ্রমচ্ছলে নিজ চক্ষু মার্জনা করিয়া কহিতেছে — তুমি আমার চক্ষে কুঙ্কুম দিয়াছ। প্রণয়ী তরুণ সযত্নে তাহার চিবুক ধরিয়া তুলিয়া অরণ্যভ নয়নের মধ্যে দৃষ্টি প্রেরণ করিতেছে, তারপর ফুৎকার দিবার ছলে গূঢ়-হাস্য মুকুলিত রক্তাধর সহসা চুম্বন করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে মিলিত কণ্ঠের বিগলিত হাস্য লতামণ্ডপের সুগন্ধি বায়ুতে শিহরণ তুলিতেছে।” (শরদিন্দু অমনিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, ছোটগল্প, পৃ. ১৯২) চরিত্রগুলির মানসিক অবস্থার নিরিখে গল্পের পটভূমি সৃষ্টি করেছেন। এখানে পটভূমিকা পাত্রপাত্রীদের পরিপূরক বলা যায়, পটভূমি সৃষ্টির ভাষাও মনোরম, বিশেষ করে বসন্তোৎসবের বিষয়টি আমাদের বিস্মিত করে। করুণ রসের ব্যবহারেও তিনি সিদ্ধ হস্ত। ‘অমিতাভ’ গল্পের দিগ্‌নাগের কান্না পাঠককেও অশ্রুসজ্জন করে তোলে। ব্যঙ্গ-কৌতুক, ত্রুরতা-নিষ্ঠুরতার প্রকাশেও তিনি সফল। ব্যঙ্গ-কৌতুক তথা হাস্যময় পরিবেশ সৃষ্টি করে কাহিনি কিছুটা লঘু করেছেন। লক্ষণীয়, হাসির আড়ালে চরিত্রের অসঙ্গতির কথাও ভোলেন নি। প্রাসঙ্গিকভাবে ‘বিষকন্যা’ গল্পের বটুকের কথা বলা যাক— “বটুক দ্রুত পলায়ন করিতে করিতে বলিল — মহারাজ, ও ইচ্ছা দমন করুন, আমি শয্যায় শুইয়া শুইয়া মরিতে চাই।”

ভাষার ব্যবহার নিয়ে শরদিন্দুবাবু যথেষ্ট সচেতন। লক্ষণীয় তাঁর সৃষ্ট ইতিহাসাশ্রিত গল্পগুলিতে সাধুরীতি ও চলিত রীতির ব্যবহার লক্ষণীয় উপন্যাসগুলিও তার ব্যতিক্রম নয়। সমালোচকেরা ‘গুরু-চণ্ডালী’ বলে অভিহিত করলেও কিন্তু শরদিন্দুর ব্যবহৃত ভাষা রমণীয় ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। তিনি ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে অভিনব এক জগৎ নির্মিতির সন্ধান চালিয়েছেন। তা সত্ত্বেও তাঁর কথাসাহিত্যের বিষয় ও উপস্থাপনা অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও সরস হয়ে উঠেছে। রাজশেখর বসুর মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য—

“আজকাল শুদ্ধ বাংলা দুর্লভ হয়েছে, খ্যাত লেখকেরাও বিস্তর ভুল করেন। যে অল্প ক’জন শুদ্ধি বজায় রেখেছেন তাঁদের পুরোভাগে আপনার স্থান। সংস্কৃত শব্দ, বিশেষত সেকেলে শব্দ দেখলে আধুনিক পাঠক ভড়কে যায়। আশ্চর্য এই — আপনার লেখায় এ রকম শব্দ প্রচুর থাকলেও পাঠক ভড়কায় না। বোধ হয় তার কারণ আপনার প্লটের বা বর্ণনার দুর্নিবার আকর্ষণ।”^৪

প্লট বা আখ্যান নির্মাণে স্বতন্ত্র রূপ দক্ষ। এসময় পর্বেও পাঠক তাঁর লেখাগুলি পড়ে সন্তোষ

প্রকাশ করেন। জনপ্রিয়তার প্রাচুর্যে তিনি আজও অমর।

‘ইন্দ্রতুলক’ গল্পের উদাহরণ দিলেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠবে—

‘ইতিহাসের পণ্ডিত বলিলেন, ‘গল্প শোনো। কাল রাতে প্রাচীন ইতিহাসের এক পুঁথি পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম—’

খুবই স্বাভাবিক। ইতিহাসের পুঁথি পড়িতে পড়িতে ঘুমাইয়া পড়ে না এমন মানুষ আমি দেখি নাই।

পণ্ডিত বলিতে লাগিলেন, ‘ঘুমিয়ে এক স্বপ্ন দেখলুম। আশ্চর্য স্বপ্ন। আমি যেন ত্রিকালজ্ঞ পুরুষ, শূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছি, আর আমার চোখের সামনে যুগের পর যুগ কেটে যাচ্ছে। আট হাজার বছরের পুরানো ইতিহাস চোখের সামনে দেখতে পেলুম।’

জিজ্ঞাসা করিলাম, ‘কাল রাতে কি খেয়েছিলেন?’

পণ্ডিত বলিলেন, ‘মনে নেই। গিম্বি বলতে পারেন।’

গৃহিণী বলিলেন, ‘কাঁকড়ার ঝোল আর ভাত।’

বলিলাম, ‘বুঝেছি, ইংরেজিতে যাকে নাইট মেয়ার আপনি তাই দেখেছেন আমি এবার উঠি।’

পণ্ডিত বলিলেন, ‘আরে বোসো, চা খেয়ে যাও। —ভূগোল পড়েছ?’

বলিলাম, ‘ভূগোল? ইতিহাসের স্বপ্ন দেখলেন, তার মধ্যে ভূগোল। ইস্কুলে পড়েছিলুম বটে।’ (শরদিন্দু অম্নিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, ছোটগল্প, পৃ. ২৪০)

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতিহাসাশ্রিত গল্পগুলির মধ্যে ‘সেতু’ গল্পটির প্রথম এবং শেষ কয়েকটি ছত্রে এই রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। সেখানে ‘তুমি’ মধ্যম পুরুষবাচক সর্বনাম পদের ব্যবহার লক্ষণীয়। কিন্তু তা উহ্য রয়েছে। লেখকের ভাষায় — “হঠাৎ সদ্যোজাত শিশুকণ্ঠের কান্নার শব্দে ঘুম ভাঙিয়া গেল ... পাশের ঘর হইতে কে যেন জলদমন্দ্র স্বরে বলিল, লিখে রাখ, ওরা চৈত্র ১টা ১৭ মিনিটে জন্ম ...।” (শরদিন্দু অম্নিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, ছোটগল্প, পৃ. ১৯০)

আত্মকথন রীতি উত্তম পুরুষবাচক কথনরীতি দেশে-বিদেশে বেশ একটি জনপ্রিয় রীতি। বাংলা কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই কথনরীতির প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ‘চতুরঙ্গ’, ‘ঘরে বাইরে’ প্রভৃতি উপন্যাস তার দৃষ্টান্ত। আমি, আমরা ইত্যাদি সর্বনাম পদ ব্যবহার করা হয় এ জাতীয় রীতিতে। Interior monologue বা আত্মকথন রীতিতে মানসলোকে আলো ফেলা হয় চরিত্রের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে টানা পোড়েন উত্থান-পতন লক্ষণীয় দেশ, কাল, পাত্রের সেতু তৈরি করা হয় এজাতীয় আখ্যানে। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের জাতিস্মরমূলক

গল্পগুলিতে সেই সংযোগ সেতুরই পরিচয় লক্ষণীয়। ‘অমিতাভ’, ‘রক্ত-সন্ধ্যা’, ‘মুৎপ্রদীপ’, ‘রুমাহরণ’, ‘বিষকন্যা’ ও ‘সেতু’ প্রভৃতি গল্পগুলির উপজীব্য বিষয় জাতিস্মর তথা পূর্বজীবনের স্মৃতি কথা-প্রসঙ্গ। স্মৃতি-সত্তা-ভবিষ্যতের যোগসূত্র এদের ভিত্তি। লেখক এই জাতীয় আখ্যানে কথকের ভূমিকা পালন করেন। আত্মকথন রীতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ উক্ত গল্পগুলি। জাতিস্মরতার মধ্যে দিয়ে লেখক ধূসর মায়াময় অভিনব কল্প জগৎ গড়ে তুলেছেন। ‘রুমাহরণ’ গল্পটি থেকে তার পরিচয় নেওয়া যাক —

“সেদিন পাইন্ গাছের মাথায় চাঁদ উঠিয়াছিল। আধখানা চাঁদ, কিন্তু তাহারই আলোয় বনস্থলী উদ্ভাসিত হইয়াছিল। আমি একাকী পাইন্ বনের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম। গায়ে ওভারকোট ছিল, মাথায় একটা অদ্ভুত আকৃতির পশমের টুপি পরিয়াছিলাম। এদেশের পাহাড়ীরা এইরকম টুপি তৈয়ারি করিয়া বিক্রয় করে। চাঁদের আলোয় আমার দেহের যে ছায়াটা মাটিতে পড়িয়াছিল, তাহা দেখিয়া আমারই হাসি পাইতেছিল। ঠিক একটি জংলী শিকারীর চেহারা, —হাতে একটা ধনুক কিংবা বর্শা থাকিলে আর কোনও তফাত থাকিত না।” (শরদিন্দু অমনিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, ছোটগল্প, পৃ. ৯০)

এখানেও পটভূমিকা বড় হয়ে উঠেছে। পটভূমিকানুগ পরিস্থিতির স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কথক মায়াময় পূর্বজীবনের কথাপ্রসঙ্গ উপস্থাপন করেছেন— “এই প্রকৃতির পানে চাহিয়া চাহিয়া আমার মনে হইতেছিল, এ-দৃশ্য যেন ইহজগতের নহে, কিংবা যেন কোন্ অতীত যুগ হইতে ছিঁড়িয়া আনিয়া অর্ধ-ঘুমন্ত দৃশ্যটাকে কেহ এখানে ফেলিয়া দিয়া গিয়াছে। বর্তমান পৃথিবীর সঙ্গে ইহার কোনও যোগ নাই, চন্দ্রাস্ত হইলেই অস্পষ্ট স্বপ্নের মতো ইহা শূন্যে মিলাইয়া যাইবে।” ‘শঙ্খ-কঙ্কণ’, ‘বিষকন্যা’, ‘তক্ত্ মোবারক’, ‘রুমাহরণ’ প্রভৃতি গল্পগুলির আখ্যান আধুনিক ছোটগল্পের আখ্যান-নির্মিত ওপর নির্ভরশীলতা না হলেও ছোটগল্পের গুণের দিক থেকে ছোটগল্পের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করেনি। আখ্যান যত বড়ই হোক না কেন। গল্পের কাহিনি বলাটাই লেখকের মূল উদ্দেশ্য। ফলে গল্পগুলি পরম উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। মহামুহূর্ত বা ক্ল্যাইম্যাক্স (Pointing finger) বিষয়টিও যথোপযুক্ত। ধীরে ধীরে গল্পের সমাপ্তি অংশে তিনি গল্পের উৎকণ্ঠাকে জাগিয়ে তুলেছেন। ‘বিষকন্যা’ মহামুহূর্তের বর্ণনীয় অংশটি উল্লেখযোগ্য—

“উষ্কা—প্রাণময়ি—’ বিপুল আবেগে উষ্কার বরতনু মহারাজ বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন। তাঁহার বক্ষে ঈষৎ বেদনা অনুভূত হইল। ভাবিলেন — আনন্দ-বেদনা।
উষ্কা তাঁহার বক্ষে এলাইয়া পড়িল, মধুর হাসিয়া বলিল — প্রিয়তম, তোমার বাহুবন্ধন শিথিল করিও না। এমনিভাবে আমায় মরিতে দাও।

সেনজিৎ তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন; পূর্ণমিলনের অন্তরায় কমল-কোরকগুলি বারিয়া পড়িল। তখন মহারাজ দেখিলেন, সূচীবৎ তীক্ষ্ণ ছুরিকা উল্কার বক্ষে আমূল বিদ্ধ হইয়া আছে। তাঁহারই বক্ষ নিষ্পেষণে ছুরিকা বক্ষে প্রবেশ করিয়াছে।” (শরদিন্দু অম্নিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, ছোটগল্প, পৃ. ১৭৬)

এই দৃশ্যটি মনে করিয়ে দেয় গল্পটির উৎকর্ষার কথা। যা মহামুহূর্তকে স্মরণ করায়। ট্রাজিক মহিমাও গল্পটির অন্যতম আকর্ষণ।

সর্বোপরি, ইতিহাসাশ্রিত সতেরোটি গল্পের বিষয়ানুগ, চরিত্রানুগ ও পরিবেশানুগ ভাষা-ব্যবহার লক্ষণীয়। শরদিন্দুর ভাষা ব্যবহারের দু’টি দিক আমাদের নজরে পড়ে। সরল ও প্রাঞ্জল দ্বন্দ্ব মর্ষিত নাট্য গুণ সমন্বিত।

ভাষা রীতির মূল্যায়নে তাঁর আত্মমত হল—Style দেখাইবার চেষ্টা করিবে না, মনের ভাবটিকে শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি দিবার চেষ্টা করিবে, তাহা হইলেই style আসিয়া পড়িবে। (লেখকের আদর্শ, পৃ. ২৩৮, শরদিন্দু অম্নিবাস, দ্বাদশ খণ্ড)

যাইহোক, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতিহাসাশ্রিত ছোটগল্পগুলির ব্যাখ্যা ও বিচার অনেকটাই একদেশদর্শিতার পথ থেকে সরে এসে বিপ্রতীপ দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করায় ইতিহাসাশ্রিত ছোটগল্পগুলির ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ প্রসঙ্গের কথা যেমন উঠে এসেছে তেমনি প্রকরণ বিশ্লেষণের দিকটিও যথার্থ সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক হয়ে উঠেছে বলে মনে হয়।

এবার অতীতাশ্রয়ী উপন্যাসগুলি সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেওয়া চাই। ইতিহাসাশ্রিত ছোটগল্পের প্রকরণ কৌশল যেমন অত্যন্ত প্রশংসাধন্য তেমনি অতীতাশ্রয়ী ইতিহাসমূলক উপন্যাসেরও রচনাকৌশল পাঠক-সমালোচকের প্রশংসা লাভ করেছে। বলা যায়, ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসের প্রকরণ বিষয়টিও মূলত ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে নির্মিত। ইতিহাসকে অবলম্বন করে তাঁর উপন্যাসেরও শিল্পশৈলী নির্মিত হয়েছে। ইতিহাস চরিত্র, আখ্যান, ক্লাসিক্যাল যুগের ভাষা ও জীবনযাপন প্রণালী এবং প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির সমন্বয়ে আখ্যান রচনাও তাঁর রচনশৈলীকে অনন্যমাত্রা দান করে। তাঁর গদ্যরীতি মূলত ঝা চকচকে। কোনো মরচে নেই। স্বচ্ছতোয়া নদীর মতো বেগবান। জড়তা নেই, আড়ষ্টতা নেই। শুধু গতিময় ও বেগমান। পদ্য নয় অথচ পদ্যের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। গদ্যের চলন ধর্ম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যে ধারণার পরিচয় আমরা পাই শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখার চাল দেখে তাই-ই মনে হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথায়—

“এমন মেয়ে দেখা যায় যার সহজ চলনের মধ্যেই বিনা ছন্দের ছন্দ আছে। ... সে মেয়ের চলনটাই কাব্য, তাতে নাচের তাল নাইবা লাগল, ... সেই চলন নদীর ঘাট থেকে

আরম্ভ করে রান্নার ঘর বাসরঘর পর্যন্ত। তার সঙ্গে মুদঙ্গের বোল দিতে গেলে বিপত্তি ঘটবে। ... গদ্য কাব্যেরও এই দশা। সে নাচে না, সে চলে। সে সহজে চলে বলেই তার গতি সর্বত্র। সেই গতি ভঙ্গি আবাঁধা।”^৫

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের গতি ঠিক তাই। তার চলন সর্বত্র। অবাধ গতি। নদীর ঘাট, রান্নারঘর বাসর ঘর সর্বত্র। উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠবে—

“চাঁদ অবশ্য অনেক আগেই উঠিয়াছিল, দিকচক্র হইতে প্রায় একরাশি উর্ধ্বে—আরোহণ করিয়াছিল। কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীয়মাণচন্দ্র, কিন্তু পরশু ফলকের ন্যায় উজ্জ্বল। তাহারই আলোকে বিদ্যুন্মালার ঘুমন্ত মুখখানি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। মুক্ত বেণী চুলগুলি বিস্রস্ত হইয়া মুখখানিকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছিল, মহার্ঘ বস্ত্রটি বালুকালিপ্ত অবস্থায় নিদ্রাশীতল দেহটিকে অযত্ন ভরে আবৃত করিয়াছিল। সব মিলিয়া যেন একটি শৈবালবিদ্ধ কুমুদিনী, ঝড়ের আক্রোশে উন্মূলিত হইয়া তটপ্রান্তে নিষ্কিপ্ত হইয়াছে।”^৬

এভাবেই তিনি তাঁর ইতিহাসাশ্রিত আখ্যানগুলির গদ্য প্রতিমা নির্মাণ করেছেন। এক নূতন রীতির গদ্য রচনামৌলিক পাওয়া যায়। সাধু চলিতে এমন মেশামেশি আর অন্য কোনো লেখকের রচনায় অন্তত এভাবে দেখা যায় না। বললে অত্যাধিক হবে না যে, চলিত ক্রিয়াপদের ব্যবহারের পাশাপাশি সাধুরীতির ক্রিয়াপদ ব্যবহার এত স্পষ্ট, এত সাবলীল এত গতিময়—তা তাঁর ইতিহাসাশ্রিত আখ্যান পাঠে আমাদের বিস্মিত করে তোলে। শুধু তাই নয়, শুদ্ধ সাধু ক্রিয়াপদের ব্যবহারও তাঁর লেখাগুলিকে অনন্যসুলভ করে তুলেছে। পাঠের দুর্গিবার আকর্ষণ আমাদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আবিষ্ট করে রাখে। আর ভাষা ও ভাষার ব্যবহার সম্পর্কে তাঁর মূল্যবান মন্তব্য পূর্বেই উদ্ধৃত করা হয়েছে। ভাষা ব্যবহারে অযথা, অহেতুক পদ ব্যবহার করতে চান নি। প্রতিবেশ পরিস্থিতি প্রেক্ষাপট বিষয়ানুসারী ভাষা ব্যবহারে তিনি পক্ষপাতী। তিনি যে সময়ের সমাজ জীবনেতিহাস উপন্যাস ও ছোটগল্পগুলিতে ধরতে চেয়েছেন তা ওজস্বী ভাষার মাধ্যমে কথাসাহিত্যে প্রতিফলিত হয়ে উঠেছে। এমনকি ভাষার উপযুক্ত ব্যবহারে তৎকালীন সামগ্রিক জীবনচিত্র বিধৃত হয়ে উঠেছে। ক্লাসিক্যাল যুগের চিত্রকে ফোটানোর জন্য তিনি ক্যাসিক্যাল যুগের ভাষাকেই গ্রহণ করেছেন। তিনি যে গদ্য ব্যবহার করেছেন তা একাধারে ধ্রুপদী ও আধুনিক। ভাষার প্রবাহ সময়ের নিরিখে ব্যক্তি নিরপেক্ষ। কারণ ভাষা ব্যক্তিকে গুরুত্ব দেয় না, গুরুত্ব দেয় বিষয়কে। বিষয়ের গুরুগম্ভীর চালে বা হালকা চালে চরিত্রও গুরুগম্ভীর ও হালকা চালের ব্যক্তি হয়ে উঠে। তাইতো খুব স্বাভাবিক ভাবে শরদিন্দুর ‘কালের মন্দির’র স্কন্দগুপ্ত আর শশিশেখর নামক দুই ভিন্ন চালের চরিত্র পেয়েছি। অন্যদিকে ‘তুঙ্গভদ্রার তীরে’র বিদ্যুন্মালা ও মণিকঙ্কণার ছবি দুই বিপ্রতীপতায়

অঙ্কিত। যদিও অ্যারিস্টটলের ভাষায়—চরিত্র অপেক্ষা আখ্যানের গুরুত্ব অধিক তবুও চরিত্র ছাড়া আখ্যান নিষ্প্রভ ও নিস্তরঙ্গ। অনুজ্জ্বল চরিত্র সম্বলিত আখ্যান তাৎপর্যহীন ও এককালীন। যেমন—‘ফুলমণি করুণার বিবরণ’ ও ‘আলালের ঘরের দুলাল’ জাতীয় আখ্যানধর্মী উপন্যাস। উপন্যাসের চরিত্রদের ভিন্ন ভিন্ন স্বর ফুটে ওঠে তাদের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে। তাদের মুখে ব্যবহৃত ভাষাও আখ্যান বিন্যাসকে করে তোলে তাৎপর্যপূর্ণ ও ইঙ্গিতার্থক। অবশ্য এখানে একটি কথা না বললেই নয় যে, শরদিন্দুর অন্যতম আখ্যান নির্মাণ কৌশল হ’ল—

এক. চরিত্র থেকে অন্য চরিত্রের সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিচয় উদ্ঘাটন। ‘তুমি সন্ধ্যার মেঘ’ উপন্যাসে বিগ্রহ-বীরশ্রী, অনঙ্গ-বান্ধুলির চরিত্র তারই প্রমাণ।

দুই. সূচনা পর্বে কথিত আখ্যানের অর্থ সমাপ্তি ও পুনরায় সমাপ্তি অংশের সঙ্গে সংযোগ সূত্র স্থাপন।

এতে উপন্যাসিকের বুদ্ধিদীপ্ত মননেরই পরিচয় পাওয়া যায়। ভাষার প্রকাশ ক্ষমতা, সাবলীলতা, স্পষ্টতা, কথার সামাজিক তারতম্য, ব্যক্তিগত স্বরের বৈচিত্র্যময় ভিন্নতা^৭ আখ্যানকে আরও কালজয়ী করে তোলে। রহস্যলাপ ও হাস্যরসের সংলাপ পরিবেশনেও শরদিন্দু সিদ্ধহস্ত—‘বলরাম বলিল—‘বাপু, কে তুমি? তোমার নাম কি? এখানে কি চাও?’

লোকটি বলিল—‘আমি এখানে পাহারা দিচ্ছি। আমার নাম চতুর্ভূজ নায়ক।’

বলরাম বলিল—‘কাকে পাহারা দিচ্ছ?’

চতুর্ভূজ নায়কের গৌঁফ এবং দাড়ির সঙ্গমস্থলে একটু শ্বেতাভা দেখা দিল—

‘তোমাদের পাহারা দিচ্ছি।’

বিস্মিত হইয়া বলরাম বলিল—‘আমাদের পাহারা দিচ্ছ! আমাদের অপরাধ?’

‘তোমরা গোপনীয় রাজকার্যে ব্যাপৃত আছ। পাছে বাইরের লোক কেউ আসে

তাই মন্ত্রী মহাশয়ের হুকুমে পাহারা দিচ্ছি।’

‘বুঝলাম। রাত্রেও কি পাহারা থাকে?’

‘থাকে।’

‘তুমি একা পাহারা দাও, না তোমার মতন চতুর্ভূজ আরো আছে?’^৮

এখানে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সামাজিক সম্মানের তারতম্যে ভাষার মেজাজ ও পরিস্থিতি বদলে গেছে। বলরাম পার্শ্ব চরিত্র। তাই তার ভাষাতেও এসেছে চটুল ও দুলালি চাল?

ভাষা উপন্যাস ও ছোটগল্পের প্রাণ। তাই ভাষা শুধুই একটি আখ্যানের বহিঃরঙ্গ সৌন্দর্য

বৃদ্ধি করে না অন্তঃরঙ্গ সৌন্দর্যকেও প্রকাশ করে। ভাষার কারণে অনেক কবি সাহিত্যিকের রচনা মাটি হয়েছে। বলা যায়, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও কমলকুমার মজুমদারের ভাষা অনেকটাই সুখপাঠ্য নয়। কমলকুমারের ভাষার গতি প্রকৃতি অনন্য। তাঁর ভাষার প্রাণ আছে কিন্তু—“তাঁর অন্তর্জলী যাত্রা উপন্যাসের নতুনরূপ ও ভাষা আমাদের মুগ্ধ করলেও, কমলকুমার-এর উপন্যাস সাধারণ পাঠকের জন্যে না।”^{৯৯} ভাষায় ভর করে একজন কথাকার সামাজিক, পারিবারিক, রাষ্ট্রিক, ধর্মনৈতিক, অর্থনৈতিক, ঐতিহাসিক সর্বোপরি জীবনের সামগ্রিক রূপ প্রকাশ করেন ভাষা-বিন্যাসের ওপর নির্ভর করে। তদুপরি ভাষার সৌন্দর্যে উপন্যাস ছোটগল্পের সৌন্দর্যও ফুটে বেরোয়। ভাষা মাটি হ’লে উপন্যাস ছোটগল্পের আখ্যান-বিন্যাস, চরিত্র-বিন্যাস ও ভাষা-বিন্যাস সমস্তই মাটি হয়ে যায়। এক্ষেত্রে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় নিখুঁত ভাবে বিচার বিবেচনা করে অত্যন্ত সতর্ক থেকে ভাষাকে কীভাবে প্রোজ্জ্বল ও স্পষ্টরূপে ব্যবহার করা যায় তার নব নিরীক্ষা চালিয়েছেন। তাঁর রচিত কথাসাহিত্যগুলিই উজ্জ্বল প্রমাণ। সমালোচকের ভাষায়—“... আশ্চর্য এই—আপনার লেখায় এ রকম শব্দ প্রচুর থাকলেও পাঠক ভড়কায় না। বোধহয় তার কারণ আপনার প্লটের বা বর্ণনার দুনিবার আকর্ষণ।”^{১০০} (চিঠি, তারিখ ২.৩.১৯৫৩) বাস্তব সম্মত জীবন ঘেঁষা ভাষার আকর্ষণও তদরূপ। ‘কুমার সম্ভবের কবি’ উপন্যাসটিতে কবি কালিদাসের কবি হয়ে ওঠার কাহিনির পশ্চাতে দাম্পত্য সম্পর্কের দ্বন্দ্বমথিত প্রেম ও প্রত্যাখ্যানের বাস্তব ছবি ফুটে উঠেছে। পাত্র-পাত্রীরা যেন সকলেই বাস্তব মর্মর পৃথিবীর। সকলেই যেন যশ প্রাপ্তি খ্যাতি ও যশহীনতা, খ্যাতিহীনতার লড়াই করছেন। ধনী-নির্ধন, শিক্ষিত-অশিক্ষিত মানুষের জীবনধারণ ও পালনের লড়াই—এককথায় ঐতিহ্য ও অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ের শেষে মানবিকতায়, প্রেম-বিহুলতায়, অহঙ্কার-শূন্যতায় রাজরাণী রাজপ্রাসাদ থেকে পর্ণকুটিরে নেমে এসেছেন। এক্ষেত্রে লেখক সম্পদের চেয়ে, ঐশ্বর্যের চেয়ে মানবতার জয় ঘোষণা করেছেন। তাই ভাষাও হয়ে উঠেছে দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহৃত ভাষা—

“কালিদাস মিনতি করিয়া বলিতেছেন—“কিন্তু দেবী, এ যে অসম্ভব। এই দীন

পর্ণকুটিরে—না না, এ হতে পারে না—’

হৈমশ্রী বলিলেন—‘ যেখানে আমার স্বামী থাকতে পারেন সেখানে আমিও থাকতে পারব।’

কালিদাস বলিলেন—‘না না, তুমি রাজার মেয়ে—’

হৈমশ্রী বলিলেন—আমার ও পরিচয় আজ থেকে মুছে গেছে, এখন আমি মহাকবি কালিদাসের স্ত্রী।”^{১০১}

রাজার মেয়ে হৈম আজ পর্ণকুটির স্বামীর সঙ্গে থাকবার ইচ্ছে প্রকাশ করেছে। নিজেকে আর রাজার মেয়ে হিসেবে পরিচয় দিতে সে নারাজ। এখন থেকে সে কালিদাসের স্ত্রী। সত্যিই লেখক রাজৈশ্বরের অন্তরালে ভারতীয় দাম্পত্য সম্পর্কের শাস্ত্র সত্যরূপ প্রকটিত করতে চেয়েছেন। হৈমশ্রী যেন আধুনিক নারী। স্বামীর পরিচয় দিতে সে কুণ্ঠা করেনি। স্বামীর পরিচয়ে সে বাঁচতে চায়—পিতার পরিচয়ে নয়। এ যেন সত্যিকারের একটি খাঁটি আধুনিক দাম্পত্য সম্পর্কের মিলনধর্মী উপন্যাস। অতীতের ছোঁয়া, স্পর্শ, কুহেলিকা রয়েছে ঠিকই কিন্তু অতীতের কুহেলিকা উপন্যাসের আখ্যানকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। ভাষার শাণিত রূপ হৈমশ্রী ও কালিদাসের চরিত্রকে সেকালের পারিপার্শ্বিকতা থেকে টেনে নামিয়েছে বাস্তবের মাটিতে। কথোপকথনধর্মী ভাষা প্রয়োগের ফলে চরিত্ররাও অনেক সময় নাটকীয় রূপ পরিগ্রহ করেছে। দ্বন্দ্ব ময়তার সঙ্গে নাটকীয়তাও এসেছে সমানে সমানে। ‘তুঙ্গভদ্রার তীরে’ উপন্যাসেও এই ব্যক্তি চরিত্রের পরিস্ফুটন ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় পাই।

‘অর্জুন বলিল—‘তুমি মহারাজ দেবরায়ের বাগদত্তা।’

বিদ্যুন্মালা বলিলেন—‘আমি কাউকে বাগদান করিনি। রাজায় রাজায় রাজনৈতিক চুক্তি

হয়েছে, আমি কেন তার দ্বারা আবদ্ধ হব?’

‘তোমার পিতা তোমাকে দান করেছেন।’

‘আমি কি পিতার তৈজস? আমার কি স্বতন্ত্র সত্তা নেই!’

‘শাস্ত্রে বলে স্ত্রী জাতি কখনো স্বাতন্ত্র্য পায় না।’

‘ও শাস্ত্র আমি মানি না। আমার হৃদয় আমি যাকে ইচ্ছা দান করব।’^{১২}

উপরিউক্ত কথাগুলি থেকে কি আমাদের মনে হয় শরদিন্দুর লেখাগুলি ইতিহাসের ভারে ভারাক্রান্ত। অলৌকিক জীবন বিন্যাসের ছবি? ইতিহাসের গুরুগম্ভীর জীবন কি এতে পাওয়া যায়? রাজপুত্র-রাজ-কুমারির জীবন-নাট্যের ভাষা কি ইতিহাসের প্রেক্ষাপটকে স্মরণ করায়? না। এ ভাষা, এ চিত্র বর্তমান কালের। বাস্তব-মর্মর জীবনের ছবি। ইতিহাসে একজন রাজকুমারির কি এত স্পর্ধা থাকতে পারে? আমাদের মনে হয় না। তাই বলা যায়, এ নারী বর্তমানের, বাস্তবের, ও আধুনিক মননের। স্বভাবতই ভাষাও হয়ে উঠেছে বাস্তবের চরিত্রের অনুসারী সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাষা। যে নারীর মধ্যযুগে বাক স্বাধীনতার অধিকার ছিল না সে নারী কীভাবে অকপটে উচ্চারণ করে ‘ও শাস্ত্র আমি মানি না।’ এতো মধ্যযুগীয় নারীর মনের কথা নয়—মধ্যযুগীয় প্রেক্ষাপটে নির্মিত আধুনিক চিন্তনের নারীর আঁতের কথা। চরিত্র সৃষ্টি সম্পর্কে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্পষ্ট মত হ’ল— যে চরিত্র আঁকবে তাকে উলঙ্গ করে দেখে নিতে হবে। যদিও সে চরিত্র সম্পর্কে সব কথা

লেখার প্রয়োজন নেই, তবুও তাকে সমগ্রভাবে দেখে নেওয়া চাই। শরদিন্দু সৃষ্টি চরিত্রগুলি সম্পর্কে এ মন্তব্যটি অত্যন্ত উপযুক্ত। কারণ তিনি চরিত্র সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন। তাই বিষয়-পরিবেশ অনুসারী চরিত্র সৃজন দক্ষতা লক্ষণীয়। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্যে চরিত্রগুলি অত্যন্ত প্রাণবন্ত ও প্রাপোচ্ছল ছোট-বড়-মাঝারি সর্বস্তরের চরিত্ররা বাস্তব সম্মতরূপ পেয়েছে। এমনকি ইতিহাসের বীর পুরুষ চরিত্র থেকে ছোটখাটো সমস্ত চরিত্রই বর্তমানের প্রেক্ষাপটে সৃষ্ট। স্কন্দগুপ্ত, কুমারদেবী, যৌবনশ্রী প্রমুখ চরিত্র তার দৃষ্টান্ত।

পরিশেষে, আমরা বলতে পারি, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্যে ভাষা ব্যবহারের কৌশল অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও তাৎপর্যপূর্ণ। ভাষাকে তিনি অত্যন্ত সচেতন ভাবে ব্যবহার করেছেন। তাই তাঁকে বলতে শোনা গেছে স্টাইল দেখানোর চেষ্টা করবে না, মনের ভাবটি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করলে স্টাইল আপনি এসে পড়বে। এমন কথা যিনি বলতে পারেন তিনি কি ভাষা সম্পর্কে নিবিড় চিন্তা না করে থাকতে পারেন। আর চিন্তা করেছেন বলেই তাঁর সৃষ্ট ভাষা এত অনায়াস সুন্দর, প্রাণবন্ত ও চলমান। সুতরাং বক্ষমাণ অধ্যায়ে শরদিন্দুবাবুর ব্যবহৃত ভাষাশৈলীর বিশিষ্টতা চোখে পড়বার মতো।

ক. ভাষার বাচনিক রূপ/ গোষ্ঠীগত রূপ

খ. ভাষার লেখ্য রূপ

গ. ভাষার বহিঃস্তরের অর্থ

ঘ. ভাষার অভ্যন্তরের অর্থ

ঙ. যুক্তিপূর্ণ তথ্য ব্যবহারের গঠনমূলক ছবি

চ. সামাজিক সংস্থানের প্রেক্ষিতে ভাষার ব্যবহার

ছ. সামাজিক পরিস্থিতিভিত্তিক ভাষার ব্যবহার

জ. সংজ্ঞাপনের ভাষা

ঝ. প্রুপদীয়ুগের ভাষা

ঞ. আধুনিক মননের ভাষা—

অ. ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধ

আ. সামাজিক রীতি-নীতি নিরপেক্ষ

ই. মানবিক

ঈ. বাস্তব সম্মত/মাটি ঘেঁষা ভাষা

ট. কাব্যধর্মী অর্থাৎ পদ্যরীতি

ঠ. গদ্যধর্মী—

অ. সাধু

আ. চলিত

ই. মিশ্র রীতি

ড. নাট্যধর্মী ভাষার প্রয়োগ—

অ. সংলাপ/কথোপকথনের ভাষা

আ. রহস্যলাপের ভাষা

ই. স্বগতোক্তির ভাষা

ঢ. প্রাচীন শব্দের ব্যবহার—

অ. দেশী

আ. বিদেশী

ণ. প্রতীক/সাংকেতিকময় ভাষা

ত. উপভাষার প্রয়োগ

থ. ব্যাকরণিক বাক্য ব্যবহার

দ. অভিধানগত শব্দের প্রাচুর্য

অ. তৎসম

আ. তদ্ভব

ই. অ-তৎসম

ঈ. কৃতঞ্চণ

ধ. নান্দনিকতা/শিল্পীতরূপ

ন. স্বাতন্ত্র্য রূপ

অতএব, বলা যায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষা ব্যবহারের সচেতন মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর সৃষ্ট ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্যের কথ্য বুননে। ভাষার যথাযোগ্য ও ইঙ্গিতময় ব্যবহার তাঁর লেখাগুলিকে বহুগুণিত করে তুলেছে।

চরিত্রগুলির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও পারিপার্শ্বিক অবস্থায় স্থিত মানসিক ক্রিয়া ও উদ্দীপনার ফলশ্রুতি হ'ল শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্যের ব্যবহৃত ভাষা। তাইতো প্রেমালাপের ভাষা আর মানসিক উত্তাপের ভাষা এক নয়। 'বিষকন্যা' নামক গল্পে উল্কা ও সেনজিতের প্রেমালাপের ভাষা আর 'তুঙ্গভদ্রার তীরে' উপন্যাসের অর্জুন বর্মা ও বিদ্যুন্মালার

মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বের ভাষা এক নয়। কয়েকটি ছত্র তুলে ধরলেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠবে—
 “বিদ্যুন্মালাকে সে ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভাল বাসিয়াছে, কিন্তু সমস্ত প্রাণ উৎসর্গ করিয়া ভাল বাসিয়াছে,
 মনের মধ্যে এমন নিবিড় প্রেমের অনুভূতি পূর্বে তাহার অজ্ঞাত ছিল। কিন্তু প্রেম যত গভীরই
 হোক, তাহার দ্বারা অপরাধ-বোধ তো দূর হয় না। প্রেম যখন সমস্ত হৃদয় অধিকার করিয়াছে
 তখনো মস্তিষ্কের মধ্যে চিন্তার ক্রিয়া চলিয়াছে—আমি রাজার সহিত কৃতঘ্নতা করিয়াছি; যিনি
 আমার অনন্যদাতা, যিনি আমার প্রভু, তাঁহারই সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছি।”^{১০} এ ভাষা সতত
 ক্রিয়াশীল, সজীব ও মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বের অনুসারী। মনের ঘাত-প্রতিঘাতের অভিব্যক্তি অত্যন্ত
 দৃঢ়রূপে প্রকাশ পেয়েছে। তাছাড়াও আমরা বলতে পারি, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যবহৃত ভাষা
 আখ্যান অনুসারী, চরিত্রানুগ, পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপযোগী রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। ভাষার গুণ
 ও মেজাজ তাঁর ইতিহাসাশ্রয়ী কথাসাহিত্যকে অনন্য মর্যাদায় উত্তীর্ণ করেছে। তাইতো, প্রেমালাপের
 ভাষায় আমরা গদগদ হয়ে উঠি, মানসিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় উত্তেজিত ও চিন্তিত হই, প্রাচীন
 ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বর্ণনায় মুগ্ধ হই এবং হাসির কথায় হেসে উঠি; পড়তে পড়তে হাসি স্বতোৎসারিত
 হয়ে ওঠে।

আমরা জানি, ভাষা হ'ল কথাসাহিত্যের প্রাণ। ভাষার স্বতঃস্ফূর্ত প্রাজ্ঞল ব্যবহারে কথাসাহিত্য
 হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত ও প্রোজ্জ্বল। ভাষার গুণেই কথাসাহিত্য মর্যাদা পায়। ভাষা ছাড়া কোনো
 আখ্যান, চরিত্র, পরিবেশ, দৃষ্টিকোণ, সময় ইত্যাদি কথাসাহিত্যের উপাদান উজ্জ্বল ও যথোপযুক্ত
 পরিস্ফুটন হয় না। অর্থাৎ বলা যায় যে, ভাষা নিছকই শুধু তার সৌন্দর্য ও অবয়ব পরিস্ফুটন
 কিংবা গরুগস্তীর ওজস্বরূপ দেখাবার জন্য ব্যবহার হয় না; ভাষা ব্যবহৃত হয় কোনো সাহিত্যও
 শাখার অভ্যন্তরীণ অতিরিক্ত সৌকুমার্য, তাৎপর্য ও শিল্পিত রূপ নির্মাণে। একজন কথাসাহিত্যিকের
 যাবতীয় দৃষ্টিভঙ্গি স্বচ্ছরূপে প্রকাশ পায় ভাষার সুনির্দিষ্ট ব্যবহারে। সামাজিক, রাষ্ট্রিক, রাজনৈতিক,
 পারিবারিক ও ঐতিহাসিক ইত্যাদি প্রেক্ষিত পরিস্ফুটনে তা ভিন্ন ভিন্ন মেজাজের ও রূপের ভাব
 প্রকাশ করে। অর্থাৎ একজন কথাসাহিত্যিক ভাষাকে মৃত্তিকাখচিত রংপ্রতিমা করে গড়ে তোলেন।
 ভাষার স্বচ্ছ পরিমত ধর্মকে লেখক তাঁর বাস্তব চলমান জীবনে দেখা বিষয়বস্তুর সঙ্গে মিলিয়ে
 এক অপরাপ শিল্প ভুবন গড়ে তোলেন। তাছাড়া ভাষারীতির প্রয়োগেই তো একজন লেখককে
 চেনা যায়। বাক্যপ্রতিমার রূপ নির্মাণেই তো একেক জন শিল্পীর নিজস্বতার বা প্রাতিস্বিকতার
 পরিচয় পাই। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যের বিশেষ করে ঐতিহাসিক কথাসাহিত্যের
 ভাষারীতির প্রয়োগ কৌশলেই আমরা উক্ত বিষয়টি অবগত হতে পারি। শরদিন্দুর ভাষা প্রয়োগের
 ক্ষেত্রে ছিলেন সচেতন শিল্পী। তিনি স্টাইল দেখাতে আগ্রহী ছিলেন না। তিনি মনে করতেন মনের

ভাবটিকে শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি দিলেই স্টাইল আপনা আপনি আসবে। এছাড়াও তিনি বলেছেন— জোর করে কোনো রসের (হাস্য, করুণ) কারবারি করা যাবে না। বিষয়বস্তুর নির্বাচনের নিরিখেই রস আসে—এমনটাও তাঁর অভিমত। সংক্ষেপিত বর্ণনার পক্ষপাতিও তিনি। তাঁর কথায়— “প্রকৃতির বর্ণনা কোথাও দশ পংক্তির বেশি করিবে না। যাহা সকলেই চোখে দেখিতে পায় তাহার দীর্ঘ বর্ণনা ক্লাস্তিকর।

বর্ণনীয় বিষয়ের চিত্রটি স্পষ্টভাবে মনের পটে আঁকা না থাকিলে বর্ণনা অস্পষ্ট হইবে। প্রত্যেক দৃশ্যটি Visualise করিবে।”^{৪৪} প্রকৃতি পরিবেশ, আখ্যান, দৃশ্যপট, বিষয়বস্তু সম্পর্কে যেমন তিনি অত্যন্ত সচেতন ছিলেন ঠিক তেমনি চরিত্র সৃষ্টির ব্যাপারেও সদা সচেতন ছিলেন। তাঁর কথায়— “যে চরিত্রটি আঁকিবে তাহাকে উলঙ্গ করিয়া দেখিয়া লইবে। হয়তো সে চরিত্র সম্বন্ধে সব কথা লেখার প্রয়োজন নাই, তবু তাহাকে সমগ্রভাবে দেখিয়া লওয়া চাই।”^{৪৫} আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, সাহিত্য সৃষ্টির ব্যাপারে তিনি কত পরিমাণে চিন্তাশীল ও যুক্তিনিষ্ঠ মনের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর আখ্যান রচনার ভাষাও যথেষ্ট স্পষ্ট মেজাজী। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, বিষয়বস্তু, চরিত্র, দৃষ্টিভঙ্গি, সময়, স্থানের চিত্র আঁকতে গিয়ে তিনি ধ্রুপদী সংস্কৃত গন্ধী ভাষা ও গুরুগম্ভীর পরিবেশ বর্ণনা করেছেন ঠিকই কিন্তু যখন তিনি ইতিহাসের উপাদান বর্ণনায় ক্ষান্ত থেকে বিষয়বস্তু, চরিত্র, দৃষ্টিভঙ্গি, স্থান-কাল-পাত্রের বাস্তবোচিত বর্তমান পরিসর এঁকেছেন তখন তার বর্ণনা হয়ে উঠেছে অত্যন্ত বাস্তবোচিত যুক্তিপূর্ণ, সময়োপযোগী। ভাষাও তার ধ্রুপদী রূপ ছেড়ে নেমে এসেছে বাস্তবের কঠিন পরিসরে। পরিস্থিতির ওঠা-নামার পাশাপাশি ভাষাও ওঠা-নামা করেছে। চলিত রীতির ক্রিয়াপদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে এবং শব্দ যোজনার ক্ষেত্রেও সে কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে— “কেন তুমি মিছে কষ্ট পাচ্ছ! রাজা হৃদয়বান লোক, তিনি তোমায় স্নেহ করেন, সবই সত্য। কিন্তু তাঁর অনেক ভৃত্য-পরিচর আছে, তুমি না থাকলেও তাঁর চলবে। এবং তিনি না থাকলেও তোমার চলবে। তুমি এ দেশের অধিবাসী নও। তুমি রাজার কাজ ছেড়ে দাও। চল, আমরা চুপি চুপি এদেশ ছেড়ে পালিয়ে যাই।”^{৪৬} এ ভাষা কি ঐতিহাসিক উপন্যাসে ভাষা? ঔপন্যাসিক “এই কাহিনীর ঐতিহাসিক পটভূমিকা Robert Sewell-এর A Forgotten Empire এবং কয়েকটি সমসাময়িক পাণ্ডুলিপি হইতে গৃহীত। Sewell-এর গ্রন্থখানি ৬৫ বছরের পুরাতন। তাই ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সম্পাদিত সাম্প্রতিক গ্রন্থ The Delhi Sultanate পাঠ করিয়া Sewell-এর তথ্যগুলি শোধন করিয়া লইয়াছি। আমার কাহিনীতে ঐতিহাসিক চরিত্র থাকিলেও কাহিনী মৌলিক; ঘটনা কাল খৃ ১৪৩০ -এর আশে পাশে। তখনো বিজয়নগর রাজ্যের অবসান হইতে শতবর্ষ বাকি ছিল।”^{৪৭} কাহিনীতে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট-প্রসঙ্গও চরিত্র থাকলেও

তিনি কাহিনিটিকে মৌলিক বলেছেন কারণ তিনি ইতিহাস রচনা করছেন না, করছেন ঐতিহাসিক উপন্যাস। তাইতো তিনি ইতিহাস প্রসঙ্গের বেলায় ভাষাকে অতীত অনুসারী ক্ল্যাসিক্যাল যুগের উপযোগী করে নির্মাণ করেন আর যখন তিনি অতীত খোলস ফেলে দিয়ে বাস্তবের মাটিতে পা দেন, চরিত্রগুলিকে ঐতিহাসিক রূপে আঁকেন তখন তার ভাষা হয় অত্যন্ত জীবননিষ্ঠ ও বাস্তব ঘনিষ্ঠ। এটা তাঁর ভাষা-রীতি ব্যবহারের অন্যতম কৌশল। ফর্ম ও কন্টেন্ট-এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তিনি ভাষাকে মূর্ত করে তুলেছেন। অনেকক্ষেত্রে রূপ রীতির চেয়েও ভাষা তার আপন সৌন্দর্য বিষয়বস্তুকে উপভোগ্য করে তুলেছে। হয়তো এক্ষেত্রে বঙ্কিমী রীতি ও রাবিন্দ্রীক রীতির অনুসরণ চোখে পড়বে। কারণ তিনি তাঁর লেখার আদর্শ অনেকটাই উক্ত দু'জন মহান শিল্পীর অনুসারী করে তুলতে চেয়েছেন। কোথাও কোথায় নিজস্বতা বজায়ও রেখেছেন। শিল্পীত আদিরস ব্যবহারেও তাঁর দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। “আদিরস রসের রাজা—রসরাজ, তাহাকে তাহার উচ্চ আসন হইতে নামাইয়া নগ্নমূর্তি কামকে সেই আসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিলে, realism-এর সত্যনিষ্ঠা আপন রূঢ়তার লজ্জায় আপনি অধোমুখ হইয়া পড়িবে এবং সেই সঙ্গে নবরসের নবরত্নবোধিত সাহিত্য-বিক্রমাদিত্যের ললাটে পঙ্কতিলক পরাইয়া দেওয়া হইবে।”^{১৮} অর্থাৎ সাহিত্য রস বর্জিত হলে সাহিত্য পদবাচ্য হয় না, (২৪ বৈশাখ ১৩৩৯) সাহিত্যের উদ্দেশ্য রস সৃষ্টি করা। তিনি বাস্তবিকপক্ষে এরকম সাহিত্যাদর্শের ভাবনার পক্ষপাতি।

ভাষায় কাব্যধর্মীতার বেলাতেও তিনি সচেতন শিল্পী। কখনো কখনো কাব্যময়তা, ইঙ্গিতার্থক, ব্যঞ্জনাধর্মী ভাষার ব্যবহার চরিত্র ও পরিবেশকে যথেষ্ট প্রাঞ্জল ও তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছে। কাব্যময় ভাষায় তিনি যথেষ্ট সাবলীল। তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাস, ছোটগল্পগুলি পাঠে আমরা তা বুঝতে পারি। অন্যদিকে তিনি কাব্য ভাষার মেদ ঝরিয়েছেন আখ্যান-বস্তুর পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে। লেখক তাঁর বর্ণনার ভাষায় ধ্রুপদী গুরুগম্ভীর পরিবেশ যেমন সৃষ্টি করেছেন তেমনি ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ নির্মাণেও তা বজায় রেখেছেন। কিন্তু চরিত্রের সংলাপের ভাষায় তা পরিবর্তিত হয়েছে। এখানে সংলাপে হয়ে উঠেছে অত্যন্ত সাবলীল ও ক্রিয়াশীল। অতীত ফ্রেম হলেও নারী-পুরুষের মুখে বাস্তবোচিত সংলাপই তিনি ব্যবহার করেছেন। ফলত ভাষা হয়ে উঠেছে অত্যন্ত মননধর্মী, নাট্যগুণ সমন্বিত ও বাস্তবধর্মী।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের হাতে বাংলা উপন্যাসে রোমান্স রসের উৎকর্ষ দেখা গেলেও বঙ্কিম-পূর্ব ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখকগণের ইতিহাসাশ্রিত পুস্তিকা ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাসে রোমান্সরসের কারবারি লক্ষণীয়। বলা যায় যে, ঐতিহাসিক উপন্যাসে রোমান্সের স্থান অপরিহার্য। কেননা, রোমান্সরসের মধ্যে দিয়ে একজন উপন্যাসিক অতিলৌকিক

ঘটনা, স্বপ্নাবতারণা দূরালোকের রহস্য উদ্ঘাটন করেন। শুধু তাই নয়, চরিত্রের রহস্য উদ্ঘাটনেও রোমান্সের গুরুত্ব অপরিসীম। বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত বড় মাপের ঔপন্যাসিকবৃন্দও রোমান্স-কৌশল প্রক্রিয়া অবলম্বন করে ঐতিহাসিক উপন্যাসের আখ্যান রচনা করেছেন। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ও সেই পথেরই পথিক। পূর্বসূরীদের আদর্শে দীক্ষিত হয়ে তাঁর সৃষ্ট অতীতশ্রী রচনাগুলিতে রোমান্সের অবতারণা করেছেন। ‘কালের মন্দির’য় অন্ধকূপে বন্দিনী পৃথার মধ্যে দিয়ে ঔপন্যাসিক এক দূর অতীতের স্মৃতিচিত্রের রহস্য উদ্ঘাটনে মুগ্ধীয়া দৈখিয়েছেন। এছাড়াও এই উপন্যাসে গুহ চরিত্রটি অন্ধনেও লেখক রোমান্সের অবতারণা করেছেন। ‘গৌড়মল্লার’, ‘তুমি সন্ধ্যার মেঘ’, ‘কুমার সম্ভবের কবি’, ও ‘তুঙ্গভদ্রার তীরে’ উপন্যাসেও আমরা রোমান্সরসের প্রাচুর্য লক্ষ্য করি। ‘রোমান্সরস’ সৃষ্টিতে লেখকের বর্ণনার ভাষাও হয়ে উঠেছে অতীত ধ্রুপদী যুগের ভাষা। প্রহেলিকাময়, স্বপ্নালু, কবিত্বময়, মেদপূর্ণ ঐন্দ্রজালিক ভাষা প্রয়োগে ঔপন্যাসিক ইতিহাসের আবহ তৈরি করেছেন। পাশাপাশি চরিত্র সৃষ্টিতেও কখনো কখনো রোমান্সের আনন্দে হয়েছেন মাতোয়ারা। বিশেষ করে ইতিহাস বীরের চরিত্র, কুহেলিকাময় নারী চরিত্র, সাধু ও বৌদ্ধ ভিক্ষু কিংবা আচার্য চরিত্রের সৃষ্টিতে নিয়েছেন রোমান্সের আশ্রয়। ফলত চরিত্রদের মুখে বসানো সংলাপ হয়ে উঠেছে রহস্যময় ও কুহেলিকাপূর্ণ আলো আঁধারির ভাষা। প্রেম অবতারণার ক্ষেত্রেও একই রূপের পরিচয় পাওয়া যায়। নায়ক-নায়িকার রূপ বর্ণনার বিষয়টিও বাদ পড়ে না। আলোচ্য উপন্যাসে স্কন্দের কথায়—“তোমার মতন অল্পই আছে। তোমার ন্যায় পিতৃভক্তি কর্তব্যনিষ্ঠা সাহস অতি বিরল। কিরাতের দোষ নাই; রূপে ও গুণে তুমি সকল পুরুষের লোভনীয়।”^{১৯} নারীর রূপ বর্ণনা বাংলা সাহিত্যের অন্যতম অঙ্গ। ঐতিহাসিক উপন্যাসের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য।^{২০} রত্না যশোধরা, রঙ্গনা, রাণী শিখরিণী, কুহু, গুঞ্জা, যৌবনশ্রী, বাসুলি, হৈমশ্রী, মালিনী, বিদ্যুন্মালা ও মণিকঙ্কণা প্রমুখ নারী চরিত্রের পূর্ণ বিকাশে ঔপন্যাসিক তাদের রূপ বর্ণনার বিষয়টি এড়িয়ে যেতে পারেন নি। এমনকি তাঁর ইতিহাসাশ্রিত গল্পগুলিও অনুরূপ বৈশিষ্ট্যকেই স্মরণ করায়। সোমদত্তা, উল্লা, রুমা, লোলা, ময়ূরিকা, মঞ্জুরিকা, প্রিয়দর্শিকা প্রমুখ নারীদের রূপের অতিশয্যের পরিচয় পাওয়া যায়। রূপ বর্ণনার ক্ষেত্রেও ভাষা অনেকটা কাব্যময় হয়ে ওঠে। যেমন—

“তাম্রকাম্বুধরবর্ণা লোলযৌবনা তম্বী, কবরীতে মল্লীমুকুলের মালা জড়িত, মুখে চূর্ণ মনঃশিলার প্রলেপ, কিংশুক-ফুল্ল ওষ্ঠাধর হইতে যেন রতি-মাদকতার মধু ক্ষরিয়া পড়িতেছে। কর্ণে-কর্ণিকার কলি গণ্ডের উত্তাপে ম্লান হইয়া গিয়াছে।... এই বিমোহিনীমূর্তি কুটিল অপাঙ্গে চাহিয়া নিঃশব্দে মৃদু মৃদু হাসিতেছে।”^{২১}

অপরাপরপক্ষে, এই রূপ বর্ণনার বৈপরীত্যে শরদিন্দুর ঐতিহাসিক উপন্যাস ও ছোটগল্পে সাহসিনী,

পুরুশালী, বলশালী নারী চরিত্রের পরিচয়ও পাওয়া যায়। যেমন—‘মুৎপ্রদীপ গল্পে পটুমহাদেবী লিচ্ছাবিদুহিতা কুমার দেবীর দুর্ধর্ষ প্রতাপের কথা পাঠকের অজানা হয়। তেমনি ‘বিষকন্যা’ গল্পে উষ্কার প্রচণ্ডতা প্রমত্ততার কথাও আমরা জানি। অন্যদিকে ‘গৌড়মল্লার’ উপন্যাসে গোপা যেভাবে সমাজে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছিল তা বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয়। শুধু তাই নয়, যৌবনশ্রীর পৌরুষদীপ্ত আচরণ (যৌবন-বিগ্রহের পলায়ন-প্রসঙ্গ) নারীর বলিষ্ঠতারই পরিচয়।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কিংবা রবীন্দ্রনাথের মতো শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাস ও ছোটগল্পের ভাষা নিয়ে যেমন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন তেমনি শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে কথাসাহিত্যের ভাষা সম্পর্কে স্পষ্ট মত দিয়েছেন। ভাষা কেমন হবে? কীভাবে ভাষা প্রাণ পাবে? কথাসাহিত্যের আদর্শ ভাষা কী? প্রভৃতি প্রশ্নের উত্তর তিনি যথাযথভাবে দিয়েছেন। তাঁর সৃষ্ট কথাসাহিত্যসম্ভারই প্রমাণ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কাব্যের ক্ষেত্রেই হোক, আর উপন্যাস ছোটগল্পের ক্ষেত্রেই হোক, ভাষারীতির বদল ঘটিয়েছেন বারে বারে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে। উল্লেখ্য, ‘গোরা’, ‘ঘরে বাইরে’ আর ‘চতুরঙ্গের’ ভাষারীতির দিকে তাকালে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অন্যদিকে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ভাষা সম্পর্কে বলেছেন—“স্টাইল দেখাইবার চেষ্টা করিবে না, মনের ভাবটিকে শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি দিবার চেষ্টা করিবে। তাহা হইলেই স্টাইল আসিয়া পড়িবে।”^{২২} অর্থাৎ স্টাইল সম্পর্কে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, স্টাইল হ’ল— উচ্চ চিন্তার ও ভাবের প্রকাশ। Chester field-এর মতো তিনি বলতে চান “Style is the dress of thoughts.” তাই পোশাকটাই যে সর্বস্ব নয় সেটা স্মরণ রাখতে হবে। Thoughts বাদ দিয়ে যারা style রচনা করে তারা দর্জির দোকানের পোশাক dummy পরা তৈরি করে মাত্র।”^{২৩} তিনি বলতে চান ভাষা হবে আরবী ঘোড়ার মতো, বেতো ঘোড়ার মতো নয়, ছুটলে যেন সৌন্দর্য বেরোয়।

স্বভাবতই, তিনি ভাষার বাহক হিসেবে Thoughts বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাইতো তাঁর লেখাগুলি হয়ে উঠেছে উচ্চ ভাবাদর্শের বাণীবাহক। বর্ণনার ভাষা ও সংলাপের ভাষার তারতম্যও বিস্তর। গুরুগম্ভীর পরিবেশ ও লঘু পরিবেশের মধ্যেও পার্থক্য দুষ্টর। চরিত্রের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ভাষার প্রয়োগও অতিশয় তাৎপর্যপূর্ণ। বাস্তবতা প্রকাশ ও অতীত মায়াময় জগতের প্রকাশভঙ্গির মধ্যেও ভাষার ভিন্নরূপ চোখে পড়ে।

কাহিনি বিন্যাসের ক্ষেত্রেও ঔপন্যাসিক সদা সতর্ক থেকেছেন ভাষার প্রয়োগ রীতি নিয়ে। ঐতিহাসিক কাহিনির বর্ণনায়, অতীত জীবন চিত্র পরিস্ফুটনে, অতীতাত্মীয় সংস্কৃতি ও সংস্কৃতির অন্তর্গত মানবিক ঘটনার ধারাবাহিক বিকাশ বর্ণনায়, ইতিহাস বীরের মনস্তাত্ত্বিক অন্তর্দ্বন্দ্ব বর্ণনায় লেখক যেমন দক্ষ শিল্পীর পরিচয় দিয়েছেন তেমনি দ্বন্দ্বমথিত প্রেম কাহিনি, ষড়যন্ত্র, সাধারণ

দাস-দাসী থেকে নর-নারীর প্রেম, অনৈতিহাসিক ঘটনা-চরিত্র, বাস্তবতা-অতিলৌকিতা-প্রকৃতির বর্ণনায় লেখক ভাষা প্রয়োগে দেখিয়েছেন মুনশিয়ানা। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতিহাসাশ্রিত কথাসাহিত্যের কাহিনি-বিন্যাসে প্রকরণগত দিক থেকে স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন—

ক. সংক্ষিপ্ত বিবরণ

খ. দৃশ্য বিন্যাস, উপশিরোনাম

গ. সংস্কৃত, ইংরেজি পুস্তকের পংক্তি ব্যবহারের তাৎপর্য

ঘ. প্রকৃতির বর্ণনা

ঙ. নাট্যরীতি

চ. প্রারম্ভিক পর্ব

ছ. সমাপ্তি অংশ

জ. পরিশিষ্ট অংশ

ঝ. পরিচ্ছেদ বিভাগ

ঞ. গৌণ কাহিনি

ট. উপস্থাপনা

ঠ. কাহিনির বিস্তার (পূর্বমুখ সূত্র)

ড. কাহিনির অন্তরালে অন্য কাহিনিতে চলে যাওয়া

ঢ. অতীত—বর্তমান—অতীত—বর্তমান চক্রাকারে কাহিনির বিবর্তন।

এইভাবেই শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতিহাসাশ্রিত কাহিনির নির্মাণ। উপরোক্ত উপাদানের সমন্বয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ কাহিনি গড়ে ওঠে—যা কথাসাহিত্যের প্রাথমিক শর্ত। লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে লেখকের কাহিনি বিন্যাস রীতি। অ্যারিস্টটলের সূত্র ধরে—আদি, মধ্য, অন্ত্যসম্বলিত, কার্যকারণ পরম্পরা দ্বারা শৃঙ্খলিত ও নাটকীয় রীতি আখ্যানের অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে ধরে নিয়েও বলা যায় যে, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতিহাসমূলক লেখাগুলিতে উপরোক্ত সমস্তই উপাদান বর্তমান।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় মূলত সর্বস্ত কখন ভঙ্গিরই আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। অন্যদিকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংলাপের ভাষায় নায়ক কথক চরিত্রের মুখ দিয়ে উত্তম পুরুষ বাচক বা আত্মকথনভঙ্গির প্রয়োগ কৌশল অবলম্বনে দ্বিধাবোধ করেননি। তাঁর রচিত ইতিহাসাশ্রিত ছোটগল্প আলোচনার সময়ে আমরা তা দেখিয়েছি। তবে উপন্যাসের ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক সর্বস্ত কখনরীতিরই যথেষ্ট প্রয়োগ ঘটিয়েছেন যা প্রথম শ্রেণির লেখকদের জনপ্রিয় রীতি। পরিশেষে, শ্রী সুকুমার

সেনের মস্তব্য প্রণিধানযোগ্য—

“শরদিন্দুবাবুর গল্পের গুণ বহুগুণিত করেছে তাঁর ভাষা। কাহিনীকে ভাসিয়ে তাঁর ভাষা যেন তরতর করে বয়ে গেছে সমাপ্তির সাগর সঙ্গমে। সে ভাষা সাধু না চলিত বলা মুষ্কিল। বলতে পারি সাধু-চলিত কিংবা চলিত-সাধু। শরদিন্দুবাবুর স্টাইল তাঁর নিজেরই স্বচ্ছ, পরিমিত, অনায়াসসুন্দর।”^{২৪}

খাঁটি ইতিহাস নির্ভর গল্পগুলিতে কিন্তু সাধু-চলিত ও চলিত-সাধু উভয় রীতির পরিচয় পাই। যেমন — ‘ইন্দ্রতুলক’ গল্পে — “ইতিহাসের পণ্ডিত বলিলেন, ‘গল্প শোনো। কালরাত্রে প্রাচীন ইতিহাসের এক পুঁথি পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম’ খুবই স্বাভাবিক। ইতিহাসের পুঁথি পড়িতে পড়িতে ঘুমাইয়া পড়ে না এমন মানুষ আমি দেখি নাই।

পণ্ডিত বলিতে লাগিলেন, ‘ঘুমিয়ে এক স্বপ্ন দেখলুম। আশ্চর্য স্বপ্ন। আমি যেন ত্রিকালজ্ঞ পুরুষ, শূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছি, আর আমার চোখের সামনে যুগের পর যুগ কেটে যাচ্ছে। আট হাজার বছরের পুরানো ইতিহাস চোখের সামনে দেখতে পেলুম।’ (শরদিন্দু অম্নিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, ছোটগল্প, পৃ. ২৪০) লক্ষণীয় এই ভাষা আমাদের আকর্ষণ করে। সাধু-চলিত আবার চলিত-সাধু রীতির প্রয়োগ কৌশলও মনোরম! ‘গুরু-চণ্ডালী’ ভেদাভেদকে তিনি গুরুত্বই দেন নি। ফলে প্রথম বাক্যের শেষে ‘পড়তে’ ‘পড়তে’ চলিত রীতির ক্রিয়াপদ দ্বিতীয় বাক্যে কথকের কথায় ‘পড়িতে’ ‘পড়িতে’ সাধু রীতির ক্রিয়াপদে পরিণত হয়েছে। এরকম অনেক উদাহরণ চোখে পড়ে। কারণ হিশেবে বলতে পারি যে, কথাকার ভাষার গतिकে প্রবহমান করতে চরিত্রের স্বতঃস্ফূর্ত স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে, ক্রিয়াপদের জাড্যদোষ মুক্ত করতে, আখ্যানের সাবলীল গতি আনতে এরকম মিশ্র রীতির ভাষা ব্যবহার করেছেন। তাতে সফলও হয়েছেন। পেয়েছেন কবি, সাহিত্যিক, সমালোচক, ভারততাত্ত্বিক, ইতিহাসবিদদের অকৃত্রিম প্রশংসাও। তাঁর উপন্যাসের ভাষাতেও এসেছে ধূসর মায়াময় জগতের বাস্তব রূপচিত্র। প্রাচীন কালের অনির্দেশ্য চিত্রাঙ্কন, সংস্কৃতির অন্তর্ভলয়, গোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, মানুষের মানুষে হানাহানি, জটিল জীবনাবর্ত, প্রেম-ভালোবাসা, কামনা ও দ্বন্দ্বমথিত প্রেম তাঁর উপন্যাসগুলির বিষয়। ‘তুঙ্গভদ্রার তীরে’ উপন্যাসটি থেকে উদাহরণ দিলেই বিষয়টি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে — “কম্পনদেব বিদ্যুন্মালাকে দেখিলেন। তারপর মণিকঙ্কণাকে দেখিলেন। কলিঙ্গের রাজকন্যা দু’টি শুধু অনিন্দ্য রূপসী নয়, তাঁহাদের আকৃতিতে অপূর্ব সম্মোহন, দুর্নিবার অনঙ্গশ্রী। লোভে কম্পনদেবের অন্তর লালায়িত হইয়া উঠিল।” (শরদিন্দু অম্নিবাস, তৃতীয় খণ্ড, ঐতিহাসিক উপন্যাস, তুঙ্গভদ্রার তীরে, পৃ. ৫৪৬) রূপাসক্তি, লোভ, লালসা, উদগ্রকামনা মানুষকে যে কতটা নৈতিক অধঃপতনের দিকে টেনে নিয়ে যায়, তার প্রমাণ

এই উপন্যাসের কম্পনদেব চরিত্রটি। নারীর প্রতি অনির্বাণ মোহ শুধু সে যুগে কেন এযুগেও বর্তমান, ভবিষ্যতেও থাকবে। লেখক শরদিন্দু কৌশলে মানুষের অমিতাচারী জৈবিক ক্রিয়াকে চিরকালের সমস্যা রূপে দেখাতে চেয়েছেন। তবে তার বৈপরীত্যে মহারাজ দেবরায়কে শৌযবীর্য ও শান্ত সমাহিত জৈবিক মানুষ রূপে দেখিয়েছেন। জৈবিক চাহিদা মানুষের সহজাত। কিন্তু মানুষই পারে তাকে শুচিস্মিত করে তুলতে। যিনি পারেন তিনিই তো মহৎ। যিনি পারেন না তিনি তো অসৎ। এই দুই বিপরীত মুখী ক্রিয়ার দ্বন্দ্ব লেখক রূপদঙ্কের মতো চিত্রিত করেছেন। স্বভাবতই, প্রকরণ বিচার প্রসঙ্গে ভাষা, কাহিনি-বিন্যাস ও চরিত্র সৃষ্টি ইত্যাদি অপরিহার্যভাবে এসে পড়ে।

নির্দেশিকা :

১. বিজিত কুমার দত্ত, বাংলাসাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস, পৃ. ৪০
২. তদেব, পৃ. ১
৩. R. G. Collingwood, The Idea of History, p. 240
৪. তদেব, পৃ. ৩
৫. শ্রী পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, ছন্দ-মীমাংসা ও অলঙ্কার সমীক্ষা, পৃ. ২৭০
৬. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, তৃতীয় খণ্ড, ঐতিহাসিক উপন্যাস, তুঙ্গভদ্রার তীরে, পৃ. ৫১২
৭. বিপ্লব মাঝি—উপন্যাসের ভাষা, পৃ. ১৬
৮. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, তৃতীয় খণ্ড, ঐতিহাসিক উপন্যাস, তুঙ্গভদ্রার তীরে, পৃ. ৫৬৩
৯. বিপ্লব মাঝি, উপন্যাসের ভাষা, পৃ. ৩২
১০. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, ছোটগল্প, পৃ. ৪২৬
১১. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, তৃতীয় খণ্ড, ঐতিহাসিক উপন্যাস, পৃ. ৪৭৯
১২. তদেব, পৃ. ৫৭১
১৩. তদেব, পৃ. ৫৭৩
১৪. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, দ্বাদশ খণ্ড, অসঙ্কলিত রচনা, লেখকের আদর্শ, পৃ. ২৩৮
১৫. তদেব
১৬. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, তৃতীয় খণ্ড, ঐতিহাসিক উপন্যাস, পৃ. ৫৭২

১৭. তদেব, পৃ. ৪৮৩
১৮. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস্, দ্বাদশ খণ্ড, অসঙ্কলিত রচনা, পৃ. ২০৬
১৯. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস্, তৃতীয় খণ্ড, ঐতিহাসিক উপন্যাস, পৃ. ১০৪
২০. বিজিত কুমার দত্ত, বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস, পৃ. ৩৫
২১. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস্, ষষ্ঠ খণ্ড, ছোটগল্প, পৃ. ১৯৩
২২. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস্, দ্বাদশ খণ্ড, অসঙ্কলিত রচনা, লেখকের আদর্শ,
পৃ. ২৩৮
২৩. তদেব, স্টাইল, পৃ. ২১৫
২৪. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস্, প্রথম খণ্ড, ব্যোমকেশ, পৃ. ১০